GIFT

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

Chittagong Hill Tracts Peace Accord and the Protection of Interests of Various Ethnic Groups : A Political Analysis

এম. ফিল গবেষণা প্রবন্ধ (থিসিস)

মোশারফ হোসেন
রেজিস্ট্রেশন নং- ২১৩ (১৯৯৭-১৯৯৮)

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ড. খন্দকার নাদিয়া শারমীন
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

403552

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মার্চ- ২০০৬

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঘোষণাপত্র

(DECLARATION)

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করা যাচ্ছে যে, অত্র থিসিসে পত্র পত্রিকা, জার্নাল এবং বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ থেকে যে সমস্ত তথ্য নেয়া হয়েছে, তা তথ্য সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত অংশ ব্যতীত বর্তমান থিসিসের বাকি অংশ গবেষকের নিজের। এই থিসিসের সম্পূর্ণ অংশ কিংবা অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রী বা পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী কিংবা সমমানের কোন ডিগ্রী প্রদানের জন্য জমা দেয়া হয়নি।

(ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(মোশারফ হোসেন)
এম. ফিল গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং-২১৩ (৯৭-৯৮)
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

403552

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

(PREFACE)

সুদূর মোগল আমল থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যে সকল চুক্তি করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তিনটি। প্রথমটি মোগলদের সাথে "কার্পাস তুলা চুক্তি", দ্বিতীয়টি বৃটিশদের সাথে "মীমাংসা চুক্তি", এবং তৃতীয়টি বাংলাদেশ সরকারের সাথে "পার্বত্য শান্তিচুক্তি"। প্রথম দুটি চুক্তির মাধ্যমে আদিবাসীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিতে বাধ্য থেকেছে, তৃতীয় চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারে তাদের অংশীদারিত্ব এবং স্বতন্ত্র শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেছে। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এই তৃতীয় চুক্তি স্বাক্ষরের পরে পার্বত্য সমস্যা সম্পর্কে প্রথম সারির দৈনিক পত্রিকার সৌজন্যে নাগরিক সমাজে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আসে। কারণ বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো এ প্রসঙ্গে দ্বিধাবিভক্ত এবং নিজ নিজ মত প্রকাশে অতিসোচ্চার। তাই দলমত নির্বিশেষে একটি সুন্দর ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তিটি আলোচনা করা অত্যাবশ্যক। চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধান যেমন প্রয়োজন তেমনি চুক্তিটিতে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সমস্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে কিনা তাও যথাযথ আলোচনা করা আবশ্যক। অন্যথায় ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব হুমকীর মুখে পরবে। তাই প্রস্তাবিত গবেষণায় বিষয়টির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ এবং তা পর্যালোচনার মাধ্যমে একটি সঠিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

এক বিন্দু রক্ত পিন্ড থেকে
আজকের আমি পর্যন্ত
যাদের অবদান চীর অম্লান
সেই শ্রদ্ধেয় মা ও বাবাকে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(ACKNOWLEDGEMENT)

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় বিংশ শতাব্দীতে যতগুলো এথনিক সমস্যার সৃষ্টি কিংবা সমাধান হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো "পার্বত্য চট্টগ্রাম এথনিক সমস্যা"। এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামক সংগঠনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি নামে অভিহিত। উক্ত চুক্তিটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। জাতীয় রাজনীতিতে এবং পার্বত্য অঞ্চলে উক্ত চুক্তির গুরুত্ব উপলব্দি করে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতি এবং অ-উপজাতি (বাঙালী)দের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টির উপর কাজ করার অভিপ্রায় নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন এর সাথে পরামর্শ করি। প্রফেসর ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ বিষয়ে কাজ করার জন্য আমাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেন এবং আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমার এম. ফিল গবেষণা কার্যক্রমের 'গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক' থাকার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ড. খন্দকার নাদিরা পারভীন এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং সার্বিক সহযোগিতার কারণে এই দুরুহ কাজটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এজন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া এবং ডঃ আতাউর রহমান স্যার এর নিকট যাদের বিশেষ সহযোগিতায় আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে উৎসাহিত হয়েছি। কৃতজ্ঞতা জানাই বর্তমান বিভাগীয় চেয়ারম্যান এ. কে. এম. শহীদুল্লাহ স্যার এর নিকট যাঁর শিক্ষা আমার গবেষণা কার্যক্রমটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সহায়তা করেছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রফেসর ড. নজরুল ইলামের প্রতি যিনি আমার গবেষণা কার্যের সাফল্যের জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের প্রতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রতি যাঁরা শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে সাক্ষাৎকার দিয়ে আমার গবেষণা কার্যটি সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ জনগণ, ছাত্র, পেশাজীবী এবং সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ যারা সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাদের নিকট আমি ঋণী। আমার গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি সংশ্লিষ্ট আরও অনেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যাদের নাম স্বল্প পরিসরের কারণে এখানে উল্লেখ করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত।

মোশারফ হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ	ভূমিকা		১
	১.১	প্রস্তাবিত গবেষণার তাৎপর্য	২
	১.২	গবেষণার পরিধি	৩
	১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
	১.৪	গবেষণার পদ্ধতি	৭
	১.৫	গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি		
	ভূমিকা		১০
	২.১	অবস্থান, সীমানা, ভূ-প্রকৃতি আয়তন, পাহাড়-শ্রেণী, নদ-নদী, হ্রদ, জলবায়ু।	১০
	২.২	প্রশাসনিক ইউনিট (সার্কেল, উদ্ভিদ ও প্রাণী)	১৪
	২.৩	পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর বিবরণ	১৫
	২.৪	জনসংখ্যাতত্ত্ব	১৬
	২.৫	উপজাতি পরিচিতি	১৮
	২.৬	জাতিগোষ্ঠী (ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি)	১৯
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	রাজনৈতিক বিবর্তন ঃ উৎসের দিকে ফিরে দেখা		
	ভূমিকা		২২
	৩.১	ত্রিপুরা, আরাকান রাজবংশের এবং সুলতানী শাসন	২৩
	৩.২	১৯০০ সালের সংস্কার	২৭
	৩.৩	উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসানকাল ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে দ্ব্যোদুল্যমানতা	২৮
	৩.৪	পাকিস্তানী শাসনামল	৩০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ	**স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী উপজাতীয় সংগঠনের উত্থান ঃ অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম**		
	ভূমিকা		৩৪
	৪.১	স্বাধীনত যুদ্ধ ঃ উপজাতীয় নেতৃত্বের অবস্থান	৩৫
	৪.২	স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ ঃ উপজাতীয়দের রাজনৈতিক বিকাশ	৩৭
	৪.৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ঃ উত্থান পর্ব	৪১
	৪.৪	জনসংহতি সমিতির আদর্শ ও সাংগঠনিক কাঠামো	৪৪
	৪.৫	শান্তি বাহিনীর জন্ম, সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যক্রম	৪৮
	৪.৬	অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম	৬৩
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	**পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঃ একটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা**		
	ভূমিকা		৬৯
	৫.১	১৯৭১ থেকে ১৯৮৯ সালের সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ।	৭০
	৫.২	পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯	৯৬
	৫.৩	১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ	১৫৫
	৫.৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঃ ১৯৯৭	১৬০
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	**পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঃ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রামাণ্য বিশ্লেষণ**		১৮৯
উপসংহার			২০২
তথ্যসূত্র			পরিশিষ্ট/ ক
সহায়ক গ্রন্থাবলী ও সংবাদপত্র			পরিশিষ্ট/ খ
সমীক্ষার প্রশ্নমালা			পরিশিষ্ট/ গ
মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম			পরিশিষ্ট/ ঘ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

❑ ভূমিকা ঃ

যেখানে 'আকাশে হিলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়' যেখানে 'নদী আপন বেগে পাগল পারা', যেখানে 'ঝর্না- ঝর্না তরলিত চন্দ্রিকা চন্দন বর্ণা', সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অরণ্য জনপদে নির্বাপিত হয়েছে দীর্ঘ দুই দশকের হিংসা, বিদ্বেষ আর ঘৃণার আগুন। থেমে গেছে রিকয়েললেস রাইফেলের সংহার গর্জন, মানুষের রক্ত নিয়ে পাশবিক উন্মত্ততা এবং ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত। ডিসেম্বর, ১৯৯৭- স্বাক্ষরিত হয়েছে ঐহিতাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি স্মারক। অবসান হয়েছে দেশের এক-দশমাংশ জুড়ে যুদ্ধাবস্থা ও ইনসার্জেন্সির। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ততা সমুন্নত রেখে সংবিধানের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান সমকালীন বিশ্বে এথনিক সমস্যা নিয়সনে এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। এই চুক্তি বাংলাদেশের সামনে উন্মোচিত করেছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।[১]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যেমনিভাবে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করে ঠিক তেমনি এই চুক্তির ফলে বিশ্বদরবারের এক নতুন আসন অর্জন করে। কারণ অশান্তি ও বিদ্রোহ দূরিকরণে শক্তির ব্যবহার অপরিহার্য হলেও স্থায়ী শান্তি স্থাপনে যুক্তির প্রয়োগ সর্বাগ্রগণ্য। শক্তি সাময়িক দমানোর মাধ্যম, কিন্তু যুক্তি স্থায়ী কার্যকর অস্ত্র। তাই যুক্তির নিরিখে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান (শান্তি চুক্তি) বিশ্বের সামনে নতুন আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেছে। এই চুক্তির অনুকরণে শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনে চেষ্টা করা হচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য এথনিক সমস্যার। ইচ্ছে করলে শ্রীলংকার তামিল বিদ্রোহ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর নাগা, মিজো, বোরো উপজাতিদের সশস্ত্র তৎপরতা, পাকিস্তানে সিন্ধি-মোহাজের সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির সাহায্য নিলে দক্ষিন এশিয়ার এথনিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে। রাজনৈতিক অঙ্গীকার, মানবিকতা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণের প্রতি, মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকলে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

১.১ প্রস্তাবিত গবেষণার তাৎপর্য ঃ

(Significance of the proposed study)

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার, জনসংহতি সমিতি, ইউপিডিএফ, অ-উপজাতীয় (বাঙালী) গোষ্ঠীর ভূমিকা পর্যালোচনা করলে প্রস্তাবিত গবেষণাটির তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলেও শান্তি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন আজ অবদি হয়নি। অথচ চুক্তি বাস্তবায়নের উপর পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি নির্ভর করছে। সম্প্রতি চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন উঠেছে যে, চুক্তির কিছু ধারা সংবিধান সাংঘর্ষিক কিছু ধারা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সাংঘর্ষিক সেহেতু দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ বিষয়ে সঠিক গবেষণার মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা উচিত, যাতে জনগণ, সরকার, জনসংহতি সমিতি, অ-উপজাতীয় গোষ্ঠী, উপজাতীয় গোষ্ঠী/সংগঠন নিজ নিজ অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভুল-ত্রুটিগুলো পরিহারের মাধ্যমে চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত গবেষণার গুরুত্ব রয়েছে।

১.২ গবেষণার পরিধি (Scope of the study) ঃ

গবেষণা কার্যক্রমটি মূলত, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির বিভিন্ন ধারায় পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকরি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই স্বার্থ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক পরিচিতি। এ পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান, সীমানা, ভূ-প্রকৃতি, আয়তন, নদ-নদী, জলবায়ু, প্রশাসনিক ইউনিট, উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর বিবরণ জনসংখ্যাতত্ত্ব, উপজাতি পরিচিতি, জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি। মূলত এই অংশটি উপস্থাপন করা হয়েছে এই কারণেই যে পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে জানা এবং এই অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতি-অউপজাতীয়দের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ। কারণ চুক্তিটি এই অঞ্চলকে ঘিরে এবং এই অঞ্চলে বসবাসকারীদের স্বার্থে করা হয়েছে। তাই চুক্তি বাস্তবায়নে এই গোষ্ঠীগুলোর অংশগ্রহণ যেমন প্রয়োজন তেমনি চুক্তিতে সকল গোষ্ঠীর সম স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে কিনা তাও বিশ্লেষণ করা দরকার।

দ্বিতীয় অংশে রয়েছে শান্তি চুক্তির বিভিন্ন ধারায় উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সমভাবে সংরক্ষিত হয়েছে কিনা তার উপর। এ বিষয়ে অতীতে পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল রাজনৈতিক বিবর্তন/পটপরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিসর। এই সব রাজনৈতিক বিবর্তনের উপর ভিত্তি

Dhaka University Institutional Repository

করে, পত্র-পত্রিকায় প্রাপ্ত তথ্য এবং বিজ্ঞ গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ বিষয়ে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয় ও শেষ অংশে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঃ একটি দীর্ঘ পথপরিক্রমা। এই পর্যায়ে ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলার জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়। যার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময়ে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন হওয়ায় অতীতে এ সম্পর্কে তেমন কোন কাজ হয়নি। তাই পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তথা চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় যারা ছিলেন, সরকারী কর্মকর্তা, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন উপজাতীয়-অউপজাতীয় সাধারণ ব্যক্তির নিকট থেকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের উপর ভিত্তি করে গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। তবে বিষয়টির ব্যপকতার কারণে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রকৃত তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতির কারণে কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the study)

সুদূর অতীত থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত অবস্থা বিরাজ করে আসছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার অব্যবহিত পরেই জন্ম লাভ করে জনসংহতি সমিতি, শান্তি বাহিনী, ইউপিডিএফ, পিসিপি সহ অনেক রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দল; উদ্দেশ্য পার্বত্যবাসীদের (উপজাতি)

Dhaka University Institutional Repository

স্বার্থরক্ষা। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি অনিয়মতান্ত্রিক (বিপ্লবী) আন্দোলন শুরু করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে দেখা দেয় অশান্তাবস্থা। শুরু হয় ইন্সার্জেন্সী কাউন্টার ইনসার্জেন্সী- ফল হয় প্রচুর রক্তপাত। তাই শান্তির ঝরনাধারা প্রবাহের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে দীর্ঘ ৭ বছর আলোচনার পর ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা শান্তি চুক্তি নামে প্রতিষ্ঠিত। চুক্তি স্বাক্ষরের পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণার মাধ্যমে ঐ সকল হাজারো প্রশ্নের মধ্য থেকে শুধুমাত্র সেসব প্রশ্নের যা শান্তি চুক্তির মধ্যে সকল জনগোষ্ঠীর স্বার্থ-সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ফলে একদিকে বাঙালী অন্যদিকে ক্ষুদ্র উপজাতিদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগ কতটুকু সত্য তা নিরূপণ।

খ) পার্বত্য অঞ্চলে ভোটার হতে হলে উপজাতি-অউপজাতি হিসেবে স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট প্রয়োজন। এই সার্টিফিকেট প্রদান যারা করবেন তারা সকলেই উপজাতি থেকে নির্বাচিত/ মনোনীত। এই ক্ষেত্রে উপজাতি কর্তাব্যক্তি থেকে বাঙালীরা অউপজাতির সার্টিফিকেট পেতে বৈষম্যের শিকার হবে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন। এই অভিযোগের বাস্তবতা নিরূপণও প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

গ) গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোয় সমঅধিকার একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। অথচ চুক্তি অনুযায়ী জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সচিব পদে সব সময় উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত/ মনোনীত হবে। এক্ষেত্রে অ-উপজাতি তথা বাঙালীরা সংখ্যানুপাতে যত বেশীই হোক না কেন কখনই উক্ত পদে নির্বাচিত/ মনোনীত হবেন না যা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, সংবিধান পরিপন্থী বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। উক্ত অভিমতের সত্যতা ও বাস্তবতা নিরূপন।

ঘ) জেলা পরিষদের সদস্য ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা পদে অ-উপজাতীয় ও ক্ষুদ্র উপজাতির জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না করে শুধুমাত্র চাকমা উপজাতিদের চিরস্থায়ী ভাবে মাত্রাধিক প্রতিনিধিত্ব করার যে ক্ষমতা প্রদান করেছে তা সংবিধান অনুযায়ী গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলি লংঘন ও অবমাননা করা হয়েছে বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন। অভিযোগটি কি যথার্থ? কিংবা কতটুকু যথার্থ?

ঙ) চুক্তিতে অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে ৭টি ক্ষুদ্র উপজাতি ও উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী ৫০ ভাগ বাঙ্গালী যারা মূলত অনগ্রসর তারাই মূলত উপেক্ষিত হয়েছে এবং হচ্ছে অথচ পার্বত্য অঞ্চলে অগ্রসর চাকমারাই মূলত আরো বেশি সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়েছে। যা গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর বাইরে এবং কাল্পনিক ধ্যান ধারণা প্রসূত বলে অনেকেই মনে করেন। উক্ত অভিযোগের বাস্তবতা কতটুকু?

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি ঃ (Methodology of the study)

ক) গবেষণার ক্ষেত্র (Area of Study) ঃ

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি পার্বত্য জেলা প্রস্তাবিত গবেষণা ক্ষেত্রের আওতায় আসবে।

খ) নমুনা নির্বাচন (Selection of Semple) ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙামাটি জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ, বান্দবান জেলা পরিষদ এর সদস্যবৃন্দের অনুপাত অনুযায়ী, সরকারী কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত স্থায়ী উপজাতি ও অউপজাতীয় সাধারণ জনগণ প্রস্তাবিত গবেষণায় নমুনা হিসাবে বাছাই করা হয়েছে।

গ) উপাত্তের উৎস (Source of data)

প্রস্তাবিত গবেষণায় দু-ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১) প্রাথমিক উৎস (Primary source) ঃ

প্রাথমিক উৎস হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও জেলা পরিষদের সদস্য সহ মোট ২৫ জন সদস্যের এবং সরকারী কর্মকর্তা ও সাধারণ স্থায়ী বাসিন্দাদের নিকট থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২) **মাধ্যমিক উৎস (Secondary source) ঃ**

মাধ্যমিক উৎস হিসাবে বিভিন্ন বই পুস্তক, জার্ণাল, গবেষণা প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, সরকারী বেসরকারী পরিসংখ্যান ইত্যাদি থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঘ) **উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি (Method of Collecting data) ঃ**

প্রস্তাবিত গবেষণায় সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঙ) **উপাত্ত বিশ্লেষণ (Analysis of data) ঃ**

প্রস্তাবিত গবেষণায় বিভিন্ন পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুসরণ করে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

(Organizational Structure of thesis)

প্রস্তাবিত গবেষণাটি নিম্নোক্ত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো নিম্নরূপঃ

১। ভূমিকা এবং গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি।

৩। রাজনৈতিক বিবর্তণ : উৎসের দিকে ফিরে দেখা।

৪। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : উপজাতীয় নেতৃত্বের অবস্থান এবং সাংগঠনিক কাঠামো।

Dhaka University Institutional Repository

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঃ একটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি : বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রামাণ্য বিশ্লেষণ।

এই অধ্যায় থেকে প্রস্তাবিত গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া গেল। পরবর্তী অধ্যায়ে গবেষণার তথ্যসূত্র যেহেতু তিন পার্বত্য জেলা তাই উক্ত অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি ঃ

❑ ভূমিকা ঃ

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পার্বত্য উপজাতীয় সমস্যার উৎস, ব্যপ্তি ও গভীরতা এবং শান্তিচুক্তি পরবর্তী অবস্থা তথা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার ও জনসংহতি সমিতির অবস্থান এবং চুক্তিতে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর স্বার্থ-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসৃত হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা (গবেষণা) করার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রথমেই কিছু মৌলিক তথ্য উপস্থাপন করছি। যা গবেষণার বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও গবেষণার বিষয় উপস্থাপন একান্ত জরুরী মনে করছি।

২.১ অবস্থান ঃ

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে ২১°২৫ হতে ২৩°৪৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৪ হতে ৯২°৫০ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

☆ সীমানা ঃ

ভৌগোলিক ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি পার্বত্য প্রদেশ ও মায়ানমারের পশ্চিম সীমান্তের সাথে সংযুক্ত। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বে মায়ানমারের (বার্মা) আরাকান প্রদেশ, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বাংলাদেশের সমতল উপকূলীয় চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত।

☆ ভূ-প্রকৃতি ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রকৃতি মূলতঃ ভারত, মায়ানমার এবং বাংলাদেশে বিস্তৃত সুবিশাল আরাকান ইয়োমা পর্বতমালার একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে গঠিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সমতল ভূমির গড় উচ্চতা ১২০-১৩০ ফুট। সমগ্র এলাকাটি ফেনী, কর্নফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী এবং এদের শাখা নদী ও উপ-নদীর উপত্যকা দ্বারা সুস্পষ্ট চার ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এসব উপত্যকাগুলো হচ্ছে চেঙ্গী উপত্যকা, কাসালং উপত্যকা, রাইনখিয়াং উপত্যকা এবং সাঙ্গু উপত্যকা।

পর্বতগুলো এসকল উপত্যকা সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত এবং উচ্চতা কয়েকশ ফুট থেকে কয়েক হাজার ফুট পর্যন্ত। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয় (তাজিংডং) এর উচ্চতা ৩১৮৫ ফুট (জনকণ্ঠ, ৩০ জানুয়ারী ২০০০) এবং কেওক্রাডং এর উচ্চতা ২৯০০ ফুট (সার্ভে অব বাংলাদেশ এর তথ্য) যা এই পার্বত্যাঞ্চলে অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ আমলের একজন পুলিশ কর্মকর্তা R.H. Sneyd Hutchinson ১৯০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিরুপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

"A mass of hill, ravine and cliff covered with dense bamboo, trees and creeper jungle. The mountains are steep and difficult to ascent ....., the valleys are covered for the most part with dense virgin forest, interspered with small water courses and swamps of all sizes and description ..... They are slowly yielding to the advance of civilization and by clearance and drainage is being converted into rich arable land capable of producing food and other grain in abundance.[2]

☆ **আয়তন :**

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান এই তিনটি জেলার সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বা Chittagong Hill Tracts। বৃটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত আয়তন নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

বৃটিশ ভারতে ইহার আয়তন ছিল ৬৮৮২ বর্গ মাইল[৩]। (সীমান্ত কমিশন রিপোর্ট মার্চ ১৮৭৫), পাকিস্তান আমলের ১৯৫১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে আয়তন দেখা যায় ৫১৩৮ বর্গ মাইল, ১৯৬১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে দেখা যায় ৫০৯৩ বর্গ মাইল, বাংলাদেশ আমলের ১৯৮১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে-এর আয়তন দেখা যায় ৫০৮৯ বর্গমাইল।

উল্লেখ্য যে, আয়তনের দিক দিয়ে এই পার্বত্য জেলাটি ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যায় ১৭৯৩ বর্গমাইল। তথাপি ইহা বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-দশমাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

☆ পাহাড় শ্রেণী ঃ

পাহাড়গুলোকে ১০টি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। সুবলং, মায়ানি, কাসালং, সাজেক, হরিং, বরকল, রাইনখিয়াং, চিম্বুক, মিরিঞ্জা ও বিজয় (তাজিংডং)।

☆ নদ-নদী ঃ

প্রধান নদী সাতটি, যথা : কর্ণফুলি, কাসালং, চেংগি, মাতামুহুরি, ফেনী, মায়ানি, রাইনখিয়াং এবং সাংগু। স্থানীয় পর্বতমালার মধ্যবর্তী উপত্যকার মধ্য দিয়ে উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে এ সকল নদী চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এ অঞ্চলের নদীগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এগুলো অত্যন্ত খরস্রোতা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী।

☆ হ্রদ ঃ

প্রাকৃতিক হ্রদ ও কৃত্রিম হ্রদ দুটোই এ অঞ্চলে দেখা যায় ঃ রাইনখিয়ান, কাইন ও বোগাকাইন হলো প্রাকৃতিক হ্রদ। অন্যদিকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দেয়ার ফলে সৃষ্ট হ্রদ কাপ্তাই একটি বৃহত্তর কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। যার আয়তন ২৬৫ বর্গমাইল।

☆ জলবায়ু ঃ

জলবায়ু বিভাজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল চিরহরিৎ উদ্ভিজ মন্ডলীর উষ্ণতা প্রধান অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫০ সে. মি.। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

৩০° সেলসিয়াস এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ২০° সেলসিয়াস। গ্রীষ্মকালে ৪০°/৪২° সেলসিয়াস এবং শীতকালে ৪°/৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠানামা করে।[৪]

২.২ প্রশাসনিক ইউনিট ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি জেলা ও ২৫টি থানা নিয়ে গঠিত। জেলাগুলো হলো খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি বান্দরবান। থানাগুলোর মধ্যে খাগড়াছড়িতে ৮টি যথা- খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, দিঘিনালা, মাটিরাঙ্গা, রামগড়, মানিকছড়ি, মহালছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি।

রাঙ্গামাটিতে ১০টি যথা- রাঙ্গামাটি, বাঘাইছড়ি, লংগদু, বরকল, নানিয়ারছড়ি, কাউকালি, জুরাইছড়ি, কাপ্তাই, রাজস্থলি ও বিলাইছড়ি।

বান্দরবানে ৭টি যথা- বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, রুমা, লামা, থানচি, আলিকদম ও নাইক্ষংছড়ি।

☆ সার্কেল :

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিভিন্ন উপজাতি কর্তৃক অধ্যুষিত সেহেতু প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার্থে Bengal Government ১৯০০ সালে এই বিস্তৃত পার্বত্যভূমিকে তিনটি সার্কেল যথা- চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেলে বিভক্ত করে প্রত্যেক সার্কেলের জন্য একজন রাজা বা প্রধান নিযুক্ত করেন। ম্যাপে সার্কেলগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

☆ **উদ্ভিদ ও প্রাণী ঃ**

পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্ধেকেরও বেশী ভূমি পাহাড়ী ও বনাচ্ছাদিত। বনভূমি একাধারে চিরসবুজ, পর্ণমোচী বৃক্ষ এবং ঘন ঝোপঝাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। বনভূমিতে সেগুন, তৃণ, তেলসূর, গর্জন, গামার, জাম্বল, চাপালিশ, কড়ই ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ এবং প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে। বনভূমির মোট পরিমাণ প্রায় ৭০৪৬ বর্গ কি. মি.। বনভূমিতে রয়েছে হাতী, বানর, বনগরু ইত্যাদি বণ্যপ্রাণী এবং নানা প্রজাতির দুস্প্রাপ্য পাখ-পাখালি, বাঘ এখন দুস্প্রাপ্য।

২.৩ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর বিবরণ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠী প্রধানত: দুটি ভাগে বিভক্ত যথাঃ উপজাতি, এবং অউপজাতি (বাঙালী)। বাঙালীরা সমতল ভূমি থেকে আগত এবং এদের অধিকাংশই মুসলিম। অবশ্য কিছু হিন্দু পরিবারও আছে। বাঙালীদের অধিকাংশই সরকারী অভিভাসন প্রক্রিয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করে। বিশেষ করে পাকিস্তান আমল থেকে এদের সংখ্যা ক্রমানুপাতিক হারে বেড়ে যায়। অন্যদিকে উপজাতিরা এদের তুলনায় আদিম।

যদি কেউ আদিম অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা বহন করে আজও যারা বেঁচে আছে তাদের বোঝায়, তবে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদেরকে (উপজাতি) আদিম বলে বর্ণনা করলে সত্যের অপলাপ হবে। তারা সভ্যজগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। বস্তুত এরা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং এদের পারিবারিক গঠনপদ্ধতিও কিছুটা

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দুদের মত। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এরা অনেক দিন থেকেই সভ্য সমাজের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত। তাদের নৃ-তাত্ত্বিক গঠন ও সংস্কৃতিতে সমভূমি অঞ্চলের লোকদের সাথে যেমন রয়েছে অমিল, তেমনি আবার জনসংখ্যায় ঘনত্ব ও ঘটনের দিক থেকেও সমভূমি অঞ্চলের সাথে রয়েছে বৈসাদৃশ্য। নৃতাত্ত্বিক ও জাতিতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠীই এখানকার মুল আদিবাসী (Aborigines) বা ভূমিপুত্র (Son of the sail) দাবিদার হতে পারে না।[৬] এখানকার বাঙালীরা যেমন সমতল থেকে আগমন করেছে তেমনি উপজাতিরাও ত্রিপুরা, আরাকান প্রভৃতি স্থান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত (Migrated) হয়েছে। কারো ইতিহাস প্রাচীন, আর কারো ইতিহাস আধুনিক। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এবং বৃটিশ প্রশাসক Captain T. H. Lewin এর মতে, "A great portion of the hill tribes, at present living in the Chittagong Hills, undoubtedly came about two generations ago from Arakan. This is asserted both by their own traditions and by records in the Chittagong collectorate[৭]।

২.৪ জনসংখ্যাতত্ত্ব (Demography) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একমাত্র অঞ্চল যেখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন উপজাতি এবং অমুসলিম। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত (১৭৬০-১৮৯২) পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল। ১৭৬০ সালে ঐ অঞ্চলে জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। ১৮৯২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১০৭২৮৬ জন। অভিগমন আইনের

Dhaka University Institutional Repository

কড়াকড়ি এবং উচ্চ মৃত্যুহার জনসংখ্যার এই স্থিতিশীলতার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

১৯৫১ সালে আদমশুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ২৮৭৬৮৮ জন লোক বাস করে। এদের মধ্যে উপজাতীয় লোক ২৬১৫৩৮ জন ও বাঙালী ২৬১৫০ জন। অন্যদিকে ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাঙালী স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে যা নিম্নের সারণি দেখলে স্পষ্ট হবে।

	আদমশুমারি ১৯৯১			আদমশুমারি ১৯৮১		
জেলা	উপজাতীয়	অ-উপজাতীয়	মোট	উপজাতীয়	অ-উপজাতীয়	মোট
বান্দরবান	১১০৩৩৩	১১৯২৭৯	২২৯৬১২	৮৯৫০৩	৭২৪৮৪	১৬১৯৮৭
খাগড়াছড়ি	১৬৭৫১৯	১৭২৫৭৬	৩৪০০৯৫	১৭২৮৮০	৯২৭১০	২৬৫৫৯০
রাঙামাটি	২২৩২৯২	১৭৪৪২১	৩৯৭৭১৩	১৭৭০৭৫	১০৩৭০৪	২৮০৮৭৯
মোট	৫০১১৪৪	৪৬৬২৭৬	৯৬৭৪২০	৪৩৯৪৫৮	১৬৮৯৯৮	৭০৮৪৫৬

তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে মাত্র ৪০ বৎসরে বাঙালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৪০১২৬ জন প্রায়। এই বৃদ্ধিটাও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইমার্জেন্সীতে সহায়তা করেছে বলে অনেকেই মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত হাল্কা ও অনিয়মিত। বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

কড়াকড়ি এবং উচ্চ মৃত্যুহার জনসংখ্যার এই স্থিতিশীলতার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

১৯৫১ সালে আদমশুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট ২৮৭৬৮৮ জন লোক বাস করে। এদের মধ্যে উপজাতীয় লোক ২৬১৫৩৮ জন ও বাঙালী ২৬১৫০ জন। অন্যদিকে ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাঙালী স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে যা নিম্নের সারণি দেখলে স্পষ্ট হবে।

	আদমশুমারি ১৯৯১			আদমশুমারি ১৯৮১		
জেলা	উপজাতীয়	অ-উপজাতীয়	মোট	উপজাতীয়	অ-উপজাতীয়	মোট
বান্দরবান	১১০৩৩৩	১১৯২৭৯	২২৯৬১২	৮৯৫০৩	৭২৪৮৪	১৬১৯৮৭
খাগড়াছড়ি	১৬৭৫১৯	১৭২৫৭৬	৩৪০০৯৫	১৭২৮৮০	৯২৭১০	২৬৫৫৯০
রাঙামাটি	২২৩২৯২	১৭৪৪২১	৩৯৭৭১৩	১৭৭০৭৫	১০৩৭০৪	২৮০৮৭৯
মোট	৫০১১৪৪	৪৬৬২৭৬	৯৬৭৪২০	৪৩৯৪৫৮	১৬৮৯৯৮	৭০৮৪৫৬

তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে মাত্র ৪০ বৎসরে বাঙালীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৪০১২৬ জন প্রায়। এই বৃদ্ধিটাও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইন্দার্জেন্সীতে সহায়তা করেছে বলে অনেকেই মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত হাল্কা ও অনিয়মিত। বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য স্থানের জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব যেখানে প্রতি বর্গ কি. মি. এ ৮০০ জন সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতি বর্গ কি. মি. এ মাত্র ১৯০ জন। ঘন অরণ্যাচ্ছাদিত পাহাড়ী ভূমিরূপ এবং প্রতিকুল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে বলে বিজ্ঞজনদের অভিমত।

নিম্নের সারণিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বন্টনের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ[৮]

সন	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১
মোট জনসংখ্যা	২৮৭৬৮৮	৩৮৫০০০	৫০৮০০০	৭০৮৪৫২	৯৬৭৪২০
প্রতি ঘন বর্গ কি. মি.	৫৭ জন	৭৫ জন	১০০ জন	১৪৭ জন	১৯০ জন

সূত্র ঃ Statistical yearbook of Bangladesh 1982 Preliminary Report of Population Census 1991.

২.৫ উপজাতি পরিচিতি :

পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভাষাভাষীর ১৩টি উপজাতি বসবাস করে। উপজাতিগুলো হলো, চাকমা (প্রকৃতপক্ষে চাঙমা), মারমা (মগ), ত্রিপুরা, মুরং (ম্রো), ব্যোম (বনযোগী), খুমি, খ্যাং (খিয়াং), চাক, তঞ্চঙ্গ্যা (চাকমা উপজাতীয় প্রশাখা), লুসাই (কুকি), রিয়াং ও উসুই (ত্রিপুরা উপজাতির প্রশাখা) এবং পাংখো (পাংখোয়া)।

Dhaka University Institutional Repository

২.৬ জাতিগোষ্ঠী (Race) ঃ

নৃ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা সবাই মঙ্গোলয়েড। আকারে খাটো, মুখমন্ডল গোলাকার, নাক চ্যাপ্টা, চুল কালো, চোখ ছোট, দাড়ি গোঁফ কম, আর গালের হাড় উঁচু- এটা তাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য যা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর ন্যায়।

☆ ধর্ম ঃ

চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মারমা ও চাক-য়া বৌদ্ধ, ত্রিপুরা ও রিয়াংরা হিন্দু। লুসাই, পাংখো ও ব্যোমরা খ্রিষ্টান। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি সম্প্রদায়গুলো সর্বপ্রাণবাদী, প্রকৃতির উপাসক অথবা সনাতন কোন ধর্মের অনুসারী। তবে বর্তমানে ক্ষুদ্র উপজাতিগুলো খৃস্টান মিশনারী ও এনজিও এর প্রভাবে খৃস্টান ধর্মের দীক্ষা লাভ করেছে। এই সংক্রান্ত এনজিওদের কার্যক্রম জনসংহতি সমিতি অভিযোগ আকারে উপস্থাপন করছে।

☆ ভাষা ঃ

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় পরিবারের ইন্দো-এরিয়ান শাখার অন্তর্গত। মারমা, ত্রিপুরা, বোম, ম্রো ইত্যাদি উপজাতীয়দের ভাষা সিনো-টিবেটান পরিবারের টিবেটো-বার্মেন বা ভোট-বর্মী শাখার অন্তর্গত। লুসাই, পাংখোদের ভাষা মধ্য কুকি চিনা এবং খুমি ও খিয়াংদের ভাষা বর্মি, আরাকানি বোরো, নাগা ও কুকি চিনা ভাষারই মিশ্ররূপ। উপজাতীয়রা নিজেদের মধ্যে কথা বলে তাদের নিজেদের ভাষায়। তবে ভিন্ন উপজাতিদের সাথে কথা বলে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায়। শিক্ষার প্রসারের সাথে বর্তমানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, অন্তেঃ উপজাতীয় ভাষা হিসাবে এরা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা 'বাংলা' কে ব্যবহার করে থাকে এবং অধিকাংশ উপজাতীয়ই 'বাংলা' ভাষা বুঝে।

☆ সংস্কৃতি ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতিগুলোর প্রত্যেকটি তাদের নিজস্ব জীবনধারা, সামাজিক আচার, রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও ধর্মীয় ও গোষ্ঠী লৌকিকতা খাদ্যাভ্যাস, তথা সকল সাংস্কৃতিক উৎসবাদির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া স্বাতন্ত্র রয়েছে। সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ হলেও পাহাড়িদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই। বাংলা বছরের শেষে চাকমা ও মারমারা 'মহামনি মেলা' নামে বার্ষিক উৎসব পালন করে। এছাড়া রয়েছে 'বৈশাখী' উৎসব।

জুম চাষ তাদের জীবিকার প্রধান মাধ্যম। এক্ষেত্রে নারীরাও কর্মজীবি মুক্ত মানবী। যেহেতু একপাহাড়ে বেশি দিন জুম চাষ চলে না সেহেতু পাহাড়িদের একটি বিরাট অংশ যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায় এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে। আর এ কারণেই জমির উপর তাদের স্থায়ী স্বত্ব গড়ে ওঠে না। নৃত্যগীত, কাপড় বোনা, কারুশিল্প এদের জীবন-জীবিকার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত।

সহজ-সারল্য জীবনধারা প্রত্যেক উপজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এদের বিচারপদ্ধতিও অনেকাংশে ভিন্ন ভিন্ন। বস্তুতঃ পাহাড়িদের প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক (প্রি-ফিউডাল) সমাজ সম্পর্ক ও জীবন পদ্ধতি আধুনিক বিশ্ব সভ্যতার সাধারণ ধারা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তবে সামগ্রিক বিচারে চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার হার বেশি বলে এরা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্য দিয়ে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত জীবনধারা গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আশার কথা যে, ইদানিং সরকারি উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার ঘটায় প্রত্যেকটি উপজাতি আধুনিকতার দিকে ধাবমান।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক বিবর্তন ঃ উৎসের দিকে ফিরে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক বিবর্তন ঃ উৎসের দিকে ফিরে দেখা

❑ ভূমিকা ঃ

চিরহরিৎ ঘন অরণ্য, পাহাড়পুঞ্জ, উপত্যাকা, নদী ও ঝরনাধারা বিধৌত শান্ত জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদি সভ্যতার কোন নিদর্শন নেই। মানব বসতির ইতিহাস যেহেতু খুব একটা দীর্ঘ নয় সেহেতু জুম্ম জাতীয়তাবাদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাও বেশী দিনের নয়। ত্রিপুরা রাজবংশ, আরাকান রাজবংশ, সুলতানী শাসনামল, শেরশাহ ও মোগল আমল, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল। বৃটিশ আমল, পাকিস্তানী আমল, প্রভৃতি শাসন আমল ফেরিয়ে বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ আমল। এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দেখা যায় জুম্ম জাতীয়তাবাদের চেতনা; যার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর পার্বত্য চট্টগ্রাম আজ আমাদের মাঝে প্রবাহমান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো আলোচনা করতে গেলে সঙ্গত কারণেই উৎসের (ইতিহাসের) দিকে আমাদের তাকাতে হবে। তাই বর্তমান অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ ত্রিপুরা, আরাকান রাজবংশের এবং সুলতানী শাসন ঃ

চিরহরিৎ ঘন অরণ্য, পাহাড়পুঞ্জ, উপত্যাকা, নদী ও ঝরনাধারা বিধৌত শান্ত জনপদ পার্বত্য চট্টগ্রামে আদি সভ্যতার কোন নিদর্শন নেই। তাই এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সঙ্গত কারণেই উৎসের (ইতিহাসের) দিকে আমাদের তাকাতে হবে।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সুদূর অতীতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে ত্রিপুরা রাজ ও আরাকান রাজের মধ্যে অঞ্চলটি বহুবার হাতবদল হয়। দখল পাল্টাদখলে দেখা যায় ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জুঝা রুপা (বীর রাজা) আরাকান রাজকে পরাজিত করে উক্ত অঞ্চলটি দখল করেন এবং রাঙ্গামাটিতে রাজধানী স্থাপন করে দীর্ঘ সাড়ে তিনশত বৎসর অঞ্চলটি শাসন করেন। ৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে আরাকান রাজ সুলা সান্দ্র অঞ্চলটি দখল করেন। ১২৪০ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজা পুনরায় এটিকে উদ্ধার করার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ পৌনে তিনশ বছর অঞ্চলটিতে আরাকান রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সুলতানী আমলে, সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-৪৯) চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশ জয় করেন। এ সময় চাকমা রাজা মোয়ান শ্রী (Mowan Tshi) বার্মা হতে বিতাড়িত হয়ে আলী কদমে একজন মুসলিম রাজকর্মচারীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় চাকমারা রামু ও টেকনাফে বসতি স্থাপনের অনুমতি পায়। ১৪০৬ সালে আরাকান রাজকে মং সোমওয়ানকে বিতাড়িত করে সুয়ামংঝি সিংহাসন দখল করেন। বিতাড়িত রাজা গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহের নিকট সাহায্য কামনা করেন এবং সুলতানের সাহায্যে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

মং সোমওয়ানের উত্তরসূরী মং খারী (১৪৩৪-৩৯) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রামু ও টেকনাফ হতে চাকমাদের বিতাড়িত করেন এবং সুলতানী আমলে হারানো ভূমি উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন এবং আংশিক সফলতাও লাভ করেন। অবশ্য সুলতান ইলিয়াস শাহ (১৪৫৯-৭৪) তাঁর শাসনামলের শেষ দিকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনরায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে সম্রাট আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) রাজত্বকালে আরাকান সম্রাট নুসরাত খানের নেতৃত্ব এই অঞ্চলে স্বল্প সময়ের জন্য সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে। অবশ্য ত্রিপুরা রাজা ধন্য মানিক্য ১৫১৫ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং আরাকানের কিছু অংশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার কিছু অংশ ১৫১৮ সালে মগরাজা মিনইয়াজা কর্তৃক বেদখল হয়ে যায়। এভাবে চলতে থাকা দখল-পাল্টা দখলের খেলায় শেষ পর্যন্ত আরাকান রাজা মং ফালাউন ওরফে সিকান্দর শাহ্ (১৫৭১-১৫৯৩)ই বিজয়ী হন এবং সমগ্র চট্টগ্রাম অঞ্চল, নোয়াখালীর বেশীরভাগ এবং ত্রিপুরার কিছু অংশ জয় করেন।[৯]

শের শাহের আমলে ঈশ্বরের রাজত্ব (Land of God) নামে খ্যাত পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী চাকমা, মারমা ও অন্যান্য উপজাতিদের সহযোগিতায় পর্তুগীজ মাবিকয়া এখানে বসবাস শুরু করে। এই সময় এরা সমতলে দস্যুবৃত্তি শুরু করে এবং আরাকান রাজের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। এই সুযোগ তৎকালীন মোগল প্রশাসন গ্রহণ করেন এবং তৎকালীন অর্থাৎ ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশানুসারে সুবেদার শায়েস্তা খান সমগ্র চট্টগ্রাম দখল করেন এবং এই অঞ্চলের নাম দেন ইসলামাবাদ। ১৭৬০ সালের ১৫ই

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর বাংলার নবাব মির কাশিম পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পুরো চট্টগ্রামের শাসনভার বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে তুলে দেন। এ কথা সত্য যে, মোগল বা ইংরেজ শাসন বিনা প্রতিরোধে উপজাতীয়রা মেনে নেয়নি। ফলে, এ অঞ্চলে ইংরেজরা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত জেলা হিসাবে ঘোষণা দিতে বাধ্য হয় এবং সেখানে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকে উপজাতীয় হেডম্যানদের হাতে। ইংরেজ প্রতিনিধিগণ শুধুমাত্র কর আদায়ের মধ্যে কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকে।

"১৭৮৭ সালের ২৪ জুন তারিখে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চট্টগ্রাম প্রতিনিধির কাছে লিখিত আরাকান রাজের পত্র হাতে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজা তার পত্রে আরাকান থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে আসা কিছু গোত্রের নামোল্লেখ করেন যারা পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে উভয় দেশে লুটপাট চালাচ্ছিল। রাজার পত্রে উল্লেখিত গোত্রগুলো হচ্ছে মগ, মুরং, পাংখো এবং বনযোগী যারা এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে। আরাকান রাজা উভয় দেশের বন্ধুত্ব স্থিতিশীল রাখা এবং ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীদের ব্যবহৃত রাস্তাগুলো নিরাপদ রাখার স্বার্থে এসকল দস্যুদের পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বিতাড়নের জন্য চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।"[১০]

তৎকালীন উক্ত চিঠির কারনে এবং কাপ্তাই খালের পাড়ে অবস্থিত একটি ইংরেজ দুর্গ আক্রান্ত হওয়ায় ১৮৫৯ সালে চট্টগ্রামের কমিশনার পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রিত জেলার পরিবর্তে একজন সুপারিন্টেডেন্ট এর অধীনে আনার সুপারিশ করেন। এর ফলে ১৮৬০ সালের ২৬ জুনের 'নোটিফিকেশন

Dhaka University Institutional Repository

নম্বর ৩৩০২' অনুসারে এবং একই সালের ১ আগষ্টের 'রেইডস অব ফ্রন্টিয়ার অ্যাক্ট ২২ অব ১৮৬০' অনুসারে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা দেয়। জেলা শাসনের দায়িত্বভার দেয়া হয় পাহাড় তত্ত্বাবধায়ক বা Hill Superintendent নামে একজন রাজকর্মচারীর অধীনে। ১৮৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি সার্কেলে- চাকমা, মোং এবং যোমাং সার্কেলে বিভক্ত করে। পরবর্তীকালে প্রতিটি সার্কেলকে অনেকগুলো মৌজায় ভাগ করা হয় (১৯৩০ সালে মোট মৌজা ছিল ৩২৭টি) ১৮৯২ সালে চাকমা সার্কেলে ৯টি তালুকে বিভক্ত হয়।

১৮৮১ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ অ্যাক্ট' চালু করে পাহাড়িদের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র স্থানীয় পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য তারা ব্যবহৃত হয়েছিল।

দুইশত বৎসর আগ থেকে এ অঞ্চলে প্রশাসনিক কাঠামো এমন যে, গ্রাম প্রধানকে 'কার্বারী', মৌজা প্রধানকে 'হেডম্যান' বলা হত। হেডম্যানের সুপারিশে রাজা কার্বারী মনোনয়ন করেন এবং রাজার সুপারিশে সরকার পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিযুক্ত করেন। তবে জেলা প্রশাসক রাজার সুপারিশ মানতে বাধ্য ছিলেন না। গ্রাম বা মৌজায় ছোটখাট অপরাধের বিচার ও সামাজিক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করতেন যথাক্রমে কার্বারী ও হেডম্যান। উপজাতি প্রথা অনুসারে বিচার কার্য সম্পন্ন হয়। রাজা প্রথা বংশানুক্রমিক হলেও কার্বারী ও হেডম্যান প্রথা বংশানুক্রমিক নয়। তবে উপযুক্ত পুত্র সন্তান থাকলে বংশীয় দাবী অগ্রাধিকার পায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ ১৯০০ সালের সংস্কার ঃ

১৯০০ সালের ১মে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি-১৯০০ (Chittagong Hill Tracks Regulation 1900 Act) জারি করে। ১৯০০ সালের ১৭ মে কলকাতা গেজেটে এটি প্রকাশিত ও কার্যকর হওয়ার পর বহুবার এই আইনের সংশোধন করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আইনের অন্তর্নিহিত কতিপয় ধারা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য চরম অবমাননাকর ও প্রতিক্রিয়াশীল হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি নেতৃবৃন্দ কিন্তু এই এলাকার ভূমিতে তাদের অধিকারসহ পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে ১৯০০ সালের শাসনবিধিকে রক্ষাকবচ হিসেবে মনে করেন।

১৯০০ সালের শাসন বিধির ৪২ ধারায় বলা ছিল জেলার ডেপুটি কমিশনার বা তার মনোনীত প্রতিনিধি ইচ্ছে করলেই উপজাতিদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারবেন। পক্ষান্তরে এই আইন উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান সার্কেল চিফ, হেডম্যান, কার্বারী এবং স্থানীয় বিচার-রীতি, প্রথা, সংস্কার ও কুসংস্কারসহ যেন কিছু বিশেষাধিকার নিশ্চিত করে।

১৯০০ সালের শাসনবিধির ৩-৪ ধারায় বলা হয়েছে, বহিরাগত 'অ-উপজাতীয়দের জন্য' পার্বত্য চট্টগ্রামের জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ।

৫১ ধারায় এই রকমের বিধান ছিলো যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ডিসি যে কোন সন্দেহভাজন (অ-পাহাড়ি) ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জেলা থেকে বহিস্কার করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫২ ধারায় বলা হয়েছে, জেলা প্রশাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বহিরাগত অ-উপজাতীয় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবে না। তারা জেলা প্রশাসকের অনুমতি নিয়ে কেবল হাটবাজার এলাকায় বসবাস করতে বা অস্থায়ী দোকানপাট স্থাপন করতে পারবে। অবশ্য ১৯৩৩ সালে এক সংশোধনী বলে এই বিধান বাতিল করা হয়।

১৯০০ সালের শাসনবিধিতে উক্ত এলাকাকে 'অশাসিত বা অনিয়ন্ত্রিত এলাকা' (নন রেগুলেটেড এরিয়া) ঘোষণা করা হয়, যা ১৯২০ সালে সংশোধন করে 'একান্ত এলাকা' বা 'এক্সক্লুসিভ এরিয়া' হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯০০ সালের এই আইনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো হয় যথাক্রমে ১৯২০, ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সালে।

তবে একথা সত্য যে ১৯০০ সালের আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে অ-উপজাতীয়দের অভিবাসন বহুলাংশে রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই অনেকে ইহাকে হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েলের হৃদপিণ্ড হিসেবে অভিহিত করেন।

৩.৩ উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসানকাল ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে দ্যোদুল্যমানতা

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উপমহাদেশ বিভক্তি হওয়ার প্রশ্ন দেখা দিলে উপজাতীয়রা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পতিত হয়। তারা পাকিস্তান অংশে নাকি ভারত অংশে থাকবে কিংবা কোন অংশে না থেকে স্বাধীনভাবে থাকবে ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে। এ সম্পর্কে কামিনী মোহন দেওয়ান লিখেন, "ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে আমরা হিন্দু-মুসলমান দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া স্বীয় জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার সম্ভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

আছে কিনা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করার সময় উপস্থিত হইল। কাল প্রভাবে বর্তমানে আমরা নগণ্য সংখ্যায় পর্যবসিত হইলেও একসময় আমরাও স্বাধীন ছিলাম। অতএব এই সুযোগে আমাদের পূর্ব গৌরব ও সংস্কৃতি রক্ষাকল্পে কিছুটা স্বায়ত্ত্বশাসন লাভে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।[১১]

স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃতি কেমন হবে তা নিয়েও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এ সম্পর্কে সিদ্ধার্থ চাকমা লিখেছেন, "সার্কেল চীফদের কামনা ছিলো রাজতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি। অপরদিকে, স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে জনসমিতির একাংশের দাবী ছিল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং অপর অংশের (কামিনী মোহন গ্রুপ) দাবী ছিল বৃটেনের অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা।[১২]

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে উঠলে অ-মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতে যোগদানের চিন্তা ভাবনা করেন। এই লক্ষে কামিনী মোহন দেওয়ান ও স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল মহাত্মা গান্ধী, আচার্য কৃপালিনী, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও কংগ্রেস সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। এমতাবস্থায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ রাঙামাটিতে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মত পার্থক্যের কারণে বিশেষকরে তিন রাজা তাদের রাজত্ব ছাড়তে অনিচ্ছুক হওয়ায় কংগ্রেস প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে কংগ্রেসের চাইতে মুসলিম লীগের আগ্রহ ছিল বেশি। মুসলিম লীগ যুক্তি হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের মুসলিম নাম ও উপাধি ব্যবহারের বিষয়টি উল্লেখ করেন।[১৩] এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ৯ই আগস্ট বেঙ্গল বাউন্ডারী এওয়ার্ড কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার সিরিল রেডক্লিভ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত বিভক্তির সময় পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব রাখেন এবং ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন সেটা অনুমোদন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

৩.৪ পাকিস্তানী শাসনামল ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে প্রকাশ্যে রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। যা ২১ আগস্ট পাকিস্তান আর্মির একটি রেজিমেন্ট নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে। অন্যদিকে বোমাং সার্কেলের মারমা উপজাতীয়রা বার্মার সাথে যুক্ত হতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে এবং বার্মার সাথে একাত্মতার ঘোষণার প্রতীক হিসাবে তারা বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করে। সেখানেও পাকিস্তানী সৈন্যরা বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করে। ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানী সরকার তাদেরকে বিদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। পাকিস্তান সরকারের এই মামলায় কামিনী মোহন দেওয়ান, অসত দেওয়ান, প্রতুল দেওয়ান ঘনশ্যাম দেওয়ান- এই চারজন দুই মাসের কারাদন্ড ভোগ করেন। স্নেহ কুমার চাকমা ভারতে পালিয়ে যায় (যিনি পরবর্তীতে কোন এক সময় ত্রিপুরার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়; তাতে ১৯০০ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম এক্সক্লুডেড এরিয়া'র মর্যাদা অব্যাহত রাখা হয়। তবে সেখানে হাইকোর্টের ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারাতে কিছুটা সংশোধনী আনা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্ট '১৯০০ সালের রেগুলেশন' এর ৫১ ধারাকে সংবিধানের সাথে অতি সাংঘর্ষিক (Ultra-Vires) আখ্যা দিয়ে এটি রদ করে বলা হয় যে, ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কাউকে বহিস্কার করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামই পাকিস্তানের একমাত্র সীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা নয়, কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরাই পাকিস্তানের একমাত্র উপজাতি ছিল না। পাকিস্তান সরকার তার সীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা এবং সকল উপজাতীয়দের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অনুসরণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯০০ সালের অ্যাক্ট বহাল থাকলেও ১৯৪৮ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ অ্যাক্ট-১৮৮১' বাতিল করে দেয়া হয়। লুপ্ত হয় পাহাড়ি পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব।

'CHTS Regulation 1900 Act এর ৩৯ ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, "The Deputy Commissioner shall consult with the chiefs on important matters affecting the Administration of Chittagong Hill Tracts." অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যাপারে জেলা প্রশাসক সার্কেল চিফ বা রাজাদের সাথে পরামর্শ করবেন। কিন্তু অভিযোগ থাকে যে কোন পাহাড়ী নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ ছাড়াই ১৯৫৮ সালে কাপ্তাই বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। যার পরিণতিতে এক লক্ষ পাহাড়ি মানুষ বাস্তুভিটা ও জমিহারা হয়ে পড়ে। পুরোনো রাঙামাটি শহর চিরদিনের জন্য কাপ্তাই হ্রদের পানিতে ডুবে যায়। চাষাবাদযোগ্য জমির ৫৬.০৬% তথা

Dhaka University Institutional Repository

৫৪ হাজার একর জমি পানিতে তলিয়ে যায়। অবশ্য তৎকালীন রাজা ত্রিদিব রায় পুনর্বাসনের জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে যে প্রস্তাব রাখেন, পাকিস্তান সরকার তা অনুমোদন করেন। যার ফলে রিজার্ভ ফরেস্টের কিছু অংশ পুনর্বাসনের জন্য খালি করে দেয়া হয়।

১৯৬২ সালে প্রণীত নতুন সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা এক্সক্লুডেড এরিয়া পরিবর্তন করেন ট্রাইবেল এরিয়া' যা উপজাতীয় এলাকার মর্যাদা দেয়া হয়। ১৯৬৪ সালে এই বিশেষ মর্যাদাও বাতিল করা হয় তবে ১৯০০ সালের রেগুলেশন বাতিল করা হয়নি এবং বিশেষ আইনের অভিপ্রেত সমস্যা ব্যতীত ও উপজাতীয়রা পূর্বেকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে।

১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর প্রকাশিত এক গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বন্দোবস্ত, ভূমি লীজ, ভূমি হস্তান্তর প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত রেগুলেশন-১৯০০ এর ৩৪ ধারায় উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনেন। সংশোধনীতে দুটি উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ

ক) পাহাড়ী এবং অ-পাহাড়ী উভয়ে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কমপক্ষে ১৫ বছর যাবৎ বসবাস করছে এমন ব্যক্তিই অ-পাহাড়ী বলে সংজ্ঞায়িত হবে।

খ) পাহাড়ী বা অ-পাহাড়ী তথা অন্য যে কোন জেলার অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে পার্বত্য অঞ্চলে চত্বর চাষাবাদ (Terrace Cultivation), রাবার চাষ, শিল্প স্থাপন এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় বাড়িঘর নির্মাণের যোগ্য হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতীয়দের দৃষ্টিতে এটি ছিলো বাঙালী বসতি স্থাপনের সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। সংবিধানের উপরোক্ত সংশোধনী উপজাতীয় প্রধানদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান আমলে কার্যকর করা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর "Chittagong Hill Tracts Regulation" আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে বলবৎ করা না হলেও তা পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ থাকে কারণ, তা কোন দিন বাতিল করা হয়নি।[১৪]

দেশ বিভাগের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪৪টি অথচ ১৯৬৯ সালের জুন নাগাদ মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯১টি (CHT District Gazetters 1971)। উপজাতীয়দের জীবন মান উন্নয়নে এই সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন করা হয় যেমন, কর্ণফুলী বহুমুখী প্রকল্প (১৯৬০), কর্ণফুলী পেপার মিল (১৯৫২), কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যালস লিঃ (১৯৬৬) প্রভৃতি। উপজাতীয়দের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের মনে ঘৃণা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। এই কারণেই যে, পাকিস্তান আমলে বাঙালি অভিবাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়েছে বলে তারা মনে করে। এর কারন হিসেবে তা ১৯০০ সালের অ্যাক্ট অকার্যকর করে দেয়ার অভিযোগ তোলে। অবশ্য ১৯৪৭ সালে যেখানে উপজাতি ও অ-উপজাতি জনসংখ্যার অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৯৭% এবং ৩% সেখানে ১৯৭০ সালে সেটা দাঁড়ায় ৮৫ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ।

পাকিস্তান আমলে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা উপজাতীয়দের মনে শংকা সৃষ্টি করে, যার ফলে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও ঘৃণা পরবর্তীতে বিস্ফোরণ ঘটে। আর এর নেতৃত্ব দেয় যে সংগঠনটি তার নাম হল জনসংহতি সমিতি। জনসংহতি সমিতির সৃষ্টি, নেতৃত্ব এবং এর উত্থানের নানা দিক দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী উপজাতীয় সংগঠনের উত্থান ঃ অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তী উপজাতীয় সংগঠনের উত্থান ঃ অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম

❑ ভূমিকা ঃ

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃত্বের অবস্থান ছিল দ্বিধাবিভক্ত। যুদ্ধ পরবর্তী নেতৃত্বের সংকট, দ্বন্দ্ব, আস্থাহীনতা প্রভৃতি কারণে ১৯৭২ সালে জনসংহতি সমিতি জন্ম লাভ করে। জন্মলগ্নে সমিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থ সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এক পর্যায়ে সমিতির স্বায়ত্বশাসনের দাবি, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্ম তথা শান্তিবাহিনীর অভ্যুদয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার উক্ত অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তথা ইন্সার্জেন্সী প্রতিহত করতে কাউন্টার ইন্সার্জেন্সীর পথ বেছে নেয়। বর্তমান অধ্যায়ে দীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ উপজাতীয় নেতৃত্বের অবস্থান

উপজাতীয় জনগণের মধ্যে চাকমাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার বেশী বলে উপজাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে তাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই চাকমা নেতৃত্বই ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের বিপক্ষে অবস্থান করলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ঐ নেতৃত্বই আবার পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন সার্কেলের তিন রাজার মধ্যে একমাত্র মানিকছড়ির রাজা মং প্রু চাঁই চৌধুরী (বা মং প্রু সাইন) মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অন্য দুই সার্কেলের রাজারা ও তাঁর পরিবারবর্গ পাকিস্তান পক্ষ অবলম্বন করেন।

চাকমা সার্কেলের রাজা ত্রিদিব রায়ের নির্দেশে হেডম্যান, কার্বারীরা গ্রামের লোকদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত 'সিভিল আর্মড ফোর্স' বা 'সিএএফ' (রাজাকার বাহিনী হিসাবে পরিচিত) এ যোগদানে বাধ্য করেন। অবশ্য অনেকে বেতন ও অস্ত্রের লোভে 'সিএইফ' এ যোগ দেয়। এছাড়া ত্রিদিব রায় নিজে তার সার্কেলের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে গিয়ে জনগণকে পাকিস্তানী বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য প্রচারণা চালান। উল্লেখ্য যে, উপজাতীয়দের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন রাজশাহী বিভাগ থেকে পালিয়ে আসা ইপিআর এর হাবিলদার মিঃ নলিনী রঞ্জন চাকমা এবং হাবিলদার মিঃ অমৃতলাল চাকমা। এরা প্রশিক্ষকের পাশাপাশি দোভাষীর কাজও করতেন। স্বাধীনতার পর এ দুজন ইপিআর হাবিলদার তাদের চাকুরী ফেরত না পেয়ে ১৯৭৩ সালে শান্তি বাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। রাজা ত্রিদিব রায় মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান চলে যান এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আর দেশে ফিরে আসেননি।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের সময় উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন মুখী অবস্থানের কারনে সাধারণ উপজাতীয়রা যেমন সঠিক দিক নির্দেশনা পায়নি, ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগেরও রয়েছে এক্ষেত্রে ব্যর্থতা। এই সময় আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাদের উপজাতীয় প্রার্থীদেরকে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠিত করতে পারেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে যুদ্ধের সময় দেখা যায় প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী কুমার কোকনাদক্ষ রায় নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ভারতে যাওয়ার পথে মুক্তিবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন।[১৫] অপরদিকে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী প্রার্থী চারু বিকাশ চাকমা উপজাতি ছাত্র যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যাবার জন্য উৎসাহিত করলেও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়কালে অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেছিলেন বলে শোনা যায়।[১৬] অন্যদিকে উপজাতীয় তরুণ ও যুবক সমাজের জনপ্রিয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা মুক্তিযুদ্ধে উপজাতীয়দের ভূমিকা কি হবে বা কি হওয়া বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে পরিস্কার বক্তব্য রাখতে ব্যর্থ হন।

সুতরাং দেখা যায় যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় অধিকাংশ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা করে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কাজ করে। যার ফলে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময় মুক্তিবাহিনীর সদস্য কর্তৃক উপজাতীয়দের লাঞ্ছিত হতে দেখা যায়। এ জাতীয় বেদনাদায়ক ভুল সমতলের বাঙালি ও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক অনভিপ্রেত দূরত্ব সৃষ্টি করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা পরস্পর সৃষ্ট মনস্তত্ত্বের ছাপ পরবর্তী ঘটনাবলীকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। উপজাতীয় রাজাকাররা এ সময় গভীর অরণ্যে পালিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তারা সশস্ত্র ও সংগঠিত হয়ে 'শান্তিবাহিনী' নামে সংগঠন গড়ে তোলে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ ঃ উপজাতীয়দের রাজনৈতিক বিকাশ

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামে একটি নূতন রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা' বুকে নিয়ে। আগেই উল্লেখ করেছি, মুক্তিযুদ্ধে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় সহ উপজাতীয় নেতৃত্বের একটি বিরাট অংশ পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাঙালীদের সাথে একটি মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই সমস্যাটি মুক্তিবাহিনীর কিছু সদস্যদের আবেগতাড়িত আচরণের কারনে আরো জটিল হয়ে ওঠে। একদিকে মুক্তিবাহিনী অন্যদিকে উপজাতীয় গোষ্ঠীর মুখোমুখী অবস্থানের ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান এবং উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ঘোচানোর উদ্যোগ গ্রহণ ছিল তৎসময়ের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈকিত ক্ষেত্রে পুনর্গঠন ও আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের কাজেই মূলতঃ ব্যস্ত ছিল বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসন। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে।

এই দিকে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন চলাকালে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ চারুবিকাশ চাকমার নেতৃত্বে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সাথে দেখা করে উপজাতিদের জন্য পৃথক সাংবিধানিক রক্ষাকবচের দাবী জানান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন চারু বিকাশ চাকমা, মং শান চৌধুরী, দেবদত্ত খীসা, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, অশোক মিত্র, রুপায়ন দেওয়ানসহ আরো দুইজন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন যে, উপজাতীয়দের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা হবে। ভূমির অধিকার পূর্বের ন্যায় ভোগ করবে এবং সরকারী চাকুরীতে উপজাতীয়দের ন্যায্য অংশ প্রদান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মং রাজা মং প্রু চাঁই এর নেতৃত্বে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, যিনিতা রায়, কে কে রায়, মং শৈ প্রু এবং সুবিমল দেওয়ান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমনের সাথে সাক্ষাত করতে তার দপ্তরে যান। প্রধানমন্ত্রী উক্ত সময়ে জরুরী কাজে বাইরে থাকা প্রতিনিধি দলটি চার দফা দাবী সংবলিত একটি দাবীনামা প্রধানমন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছে রেখে আসেন।

☆ **চারদফা দাবীগুলো হল ঃ**

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের রেগুলেশন-১ এর মত অনুরূপ বিধি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয় এরূপ বিধি ব্যবস্থা সংবিধানে থাকবে।

৪। উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

উক্ত দাবীনামার প্রত্যুত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পেশ করা দাবী মেনে নিলে জাতিগত অনুভূতি বৃদ্ধি পাবে। অখণ্ড জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির অস্তিত্ববোধ না থাকা বাঞ্ছনীয়। বৃহত্তম বাঙালী জাতীয়তাবাদে নিজেদের অস্তিত্ব বিকাশ সাধন করার পরামর্শ দেন তিনি। দাবী মেনে না নেয়ার চাইতে প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ হন তাদেরকে জাতিগত অস্তিত্ব বিলোপ করতে বলাতে।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

গণপরিষদ সদস্য হিসাবে ১৯৭২ সালের ২৪ এপ্রিল মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ইতিপূর্বে পেশকৃত ৪ দফা দাবীর আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদার দাবী পেশ করেন। কিন্তু খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি এবং গণপরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য কোন বিশেষ রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদানে সম্মত হয়নি।[১৯]

এছাড়াও স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে রাঙ্গামাটির জনসভায় সমগ্র অধিবাসীকে 'বাঙালী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য উপজাতীয়দের অনুভূততে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনেকে ইহাকে অগ্নিস্ফুলিংগে ঘৃত ঢালা বলে উল্লেখ করেন।

এভাবে দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বঞ্চনার ফলে সৃষ্ট ক্ষোভের বহি:প্রকাশ স্বরূপ মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে খসড়া সংবিধানের ওপর বিতর্ক চলাকালে আবেগতাড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, "আমি চাকমা, একজন মারমা কখনো চাকমা হতে পারে না। একজন চাকমা হতে পারে না একজন মুরং, একজন চাকমা কোন দিন বাঙালী হতে পারে না.....। আমি চাকমা কিন্তু বাঙালী নই। বাংলাদেশের নাগরিক-বাংলাদেশী। আপনারাও বাংলাদেশী কিন্তু আপনাদের জাতিগত পরিচয় আপনারা বাঙালী। উপজাতীয়রা কখনো বাঙালী হতে পারে না।"[২০]

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হলে সকল নাগরিককে বাঙালী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তবে এ কথা সত্য যে, সংবিধান প্রণেতাগণ ঐতিহাসিক বিবর্তন ও বাংলাদেশের ভৌগোলিক, নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। 'একক বা ইউনিটারি' কাঠামোয় 'পৃথক আইনসভা বা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন' প্রদানের কোন অবকাশ আমাদের সবিধানে নেই। তবে সংবিধান প্রণেতাগণ ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর বিকাশ, তাদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্খার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে সংবিধানে ২৮ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গে সংবিধানের অন্যান্য অনুচ্ছেদেও অনগ্রসর ও বিশেষ অঞ্চলগুলোর জন্য বিধিবিধান প্রণয়নেরও ব্যাপক সুযোগ রাখা হয়। আমাদের দেশে এথনিক মাইনোরিটির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ০.৫০ শতাংশেরও কম। সংবিধান প্রণেতারা এই কারনেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে এক কেন্দ্রিক করেছেন।

সংবিধানে উপজাতীয়দের চার দফা দাবী নামার স্বীকৃতি না পেয়ে অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর রাঙ্গামাটি ভাষণ উপজাতীয় এলিট শ্রেণীকে ভাবিয়ে তোলে। তারা অনুধাবন করে যে, জাতিগতভাবে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এই এলিট শ্রেণীর বড় শক্তি ছিলেন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি এই বলে উপজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন যে, "আমাদের পৃথক জাতিসত্তা হুমকির সম্মুখীন। আমরা আমাদের স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাই।" অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত বিস্ফোরিত হতে থাকে তাঁর স্লোগান। অন্যদিকে পাহাড়ী ছাত্র সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র জনগণকে মুক্তি সংগ্রামে একত্রিত হওয়ার জন্য প্রচারণা চালাতে থাকে এবং রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টিও একই লক্ষ্যে কাজ করে। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের লক্ষ্য অর্জনে ছাত্র-যুবক সহ

Dhaka University Institutional Repository

সকল পেশায় শিক্ষিত সমাজকে একটি প্লাটফরমে আনার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। আর এই প্লাটফরমটিই হচ্ছে "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।"

৪.৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ঃ উত্থান পর্ব

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে। তবে সকল উপজাতি এই শিক্ষার সমান ভাবে অংশ নেয়নি। বিশেষ করে পাঁচ এর দশক থেকে চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ঐতিহ্য ও আপন সংস্কৃতির প্রতি প্রচন্ড রক্ষণশীল অথচ আধুনিক শিক্ষায় উদ্ভাসিত একটি মধ্য শ্রেনী গড়ে ওঠে। এই নবোদ্ভুত মধ্য শ্রেণীটি চাকমা সমাজে প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। এই প্রভাবশালী সামাজিক শক্তিটি উপলব্ধি করে যে, তাদের নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে হলে সকল উপজাতীয় সমাজে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। এই লক্ষ্যে এদের অনেকেই শিক্ষকতায় পেশা নিয়ে দুর্গম ও পশ্চাৎপদ এলাকাগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শিক্ষার হারের দিক থেকে চাকমা ও অন্যান্য কয়েকটি উপজাতি সমতলের বাঙালিদের তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়ে যায়।

এই শিক্ষিত উপজাতীয় সমাজ বিশেষ করে চাকমা উপজাতি তাদের (উপজাতীয়) অধিকার আদায়ে বঙ্গবন্ধুর পদক্ষেপ ও কর্মসূচীতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে একটি শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুধাবন করে। এক পর্যায়ে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, সাথোয়াই রোয়াজা, শান্তিময় দেওয়ান, মংচানু মার্মা চারু বিকাশ চাকমা, জ্ঞানেন্দু বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, সন্তু লারমা, প্রমোদ কার্বারী, অমিয় সেন চাকমা, প্রীতি কুমার চাকমা, কালী মাধব চাকমা, সনদ কুমার চাকমা প্রমূখ পাহাড়ী নেতৃবৃন্দ রাঙামাটিতে একাধিকবার গোপন বৈঠক করে একটি শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এসব বৈঠকে শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী হলেও অন্য দলটি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। শক্তিপক্ষে নেতৃত্ব দেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। লারমার বক্তব্য ছিলো, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জোর করে বুর্জোয়া সরকারের কাছ থেকে অধিকার ছিনিয়ে আনা সম্ভব।" এই নীতির ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" জন্ম লাভ করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রামের সংগঠিত উদ্যোগের একটি ধারাবাহিকতা পরম্পরা লক্ষণীয়। ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্ব সর্বপ্রথম গঠিত হয় 'চাকমা যুবক সমিতি'। ১৯১৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'চাকমা যুবক সংঘ'। ১৯২০ সালে কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি'। এই সংগঠন দীর্ঘ ১৯ বছর কেবল সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিল। ১৯৩৯ সালে যামিনীরঞ্জন দেওয়ান ও স্নেহকুমার চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর জনসমিতি রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় 'জনসমিতি' পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে জোর তৎপরতা চালায়।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ সালে উপজাতীয় ছাত্রদের দাবী দাওয়া নিয়ে 'হিল স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। এই সংগঠনের সাথে পাকিস্তান আমলে বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সংযোগ ছিল। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে অনন্ত বিহারী খাসী ও জেবি লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি'। এই সমিতির উদ্যোগে ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম 'নিজস্ব আইন পরিষদ' সহ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সংবলিত ১৬ দফা দাবিনামা পাকিস্তান সরকারের কাছে উত্থাপন করা হয়। যার নেতৃত্ব দেন ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

স্বাধীনতার পর উপজাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের বড় অংশটি অর্থাৎ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। এই লক্ষ্যে পাকিস্তান আমলের পার্বত্য জনসমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় নামের সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটি ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে একটি সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে "পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" নামে উপজাতীয়দের একমাত্র রাজনৈতিক দল যাত্রা শুরু করে যার প্রাণপুরুষ ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। অংগ সংগঠন হিসেবে 'পাহাড়ী ছাত্র সমিতি' নামে একটি ছাত্র সংগঠনও আত্মপ্রকাশ করে। এই পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতারাই পরবর্তীকালে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমানেও তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।[২১]

১৯৭২ সালের ২৪ জুন রাঙ্গামাটির ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে লারমা ঘোষণা করেন বাঙালী জাতীয়তাবাদ পাহাড়িদের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে এই ধারণা থেকে তিনি ১৩টি উপজাতিকে 'জুম্ম

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয়তাবাদ' এর নামে নতুন এক জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এম এন লারমা গোপন মাওবাদী সংগঠন রাঙ্গামাটি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং নিজেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারী দাবি করেও 'জুম্ম জাতীয়তাবাদী' চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেহেতু লারমা কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন সেহেতু জনসংহতি সমিতির আদর্শ এই মতাদর্শে প্রভাবিত। মূলতঃ জনসংহতি সমিতি, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার গোপন সংগঠন রাঙামাটি কমিউনিস্ট পার্টিরই একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক সংগঠন।

৪.৪ জনসংহতি সমিতির আদর্শ ও সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ছিল একটি গণসংগঠন। এবং এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন উপজাতীয় শিক্ষিত সমাজ তথা চাকমা সমাজ। কেননা উপজাতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিতা তথা ৫৯ শতাংশ হলো চাকমা। এর নেতৃত্বের মধ্যে যারা ছিলেন তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা যায় তাদের অধিকাংশই ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী। ফলে উক্ত সংগঠনটিও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তথা কমিউনিস্ট আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

জনসংহতি সমিতির জন্মলগ্নেই সমিতির ঘোষণপত্রে বলা হয়েছিল 'উপজাতীয় জনগণের মুক্তিই সমিতির একমাত্র লক্ষ্য'। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছার কৌশল কি হবে সে সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা সমিতির জন্ম লগ্নে না থাকলেও পরবর্তীতে রণনীতি ও রণকৌশল স্থির করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক ও সশস্ত্র সংগ্রাম উভয় পন্থার কথা উল্লেখ করা হয়। এই লক্ষ্যে সমিতির সশস্ত্র সংগঠন তথা 'শান্তিবাহিনী' গঠন করা হয়। (পরবর্তীতে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হবে)।

Dhaka University Institutional Repository

মে. জে. (অঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (বীর প্রতীক) এর লেখা হতে জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নে প্রদত্ত হলো ৪[২২]

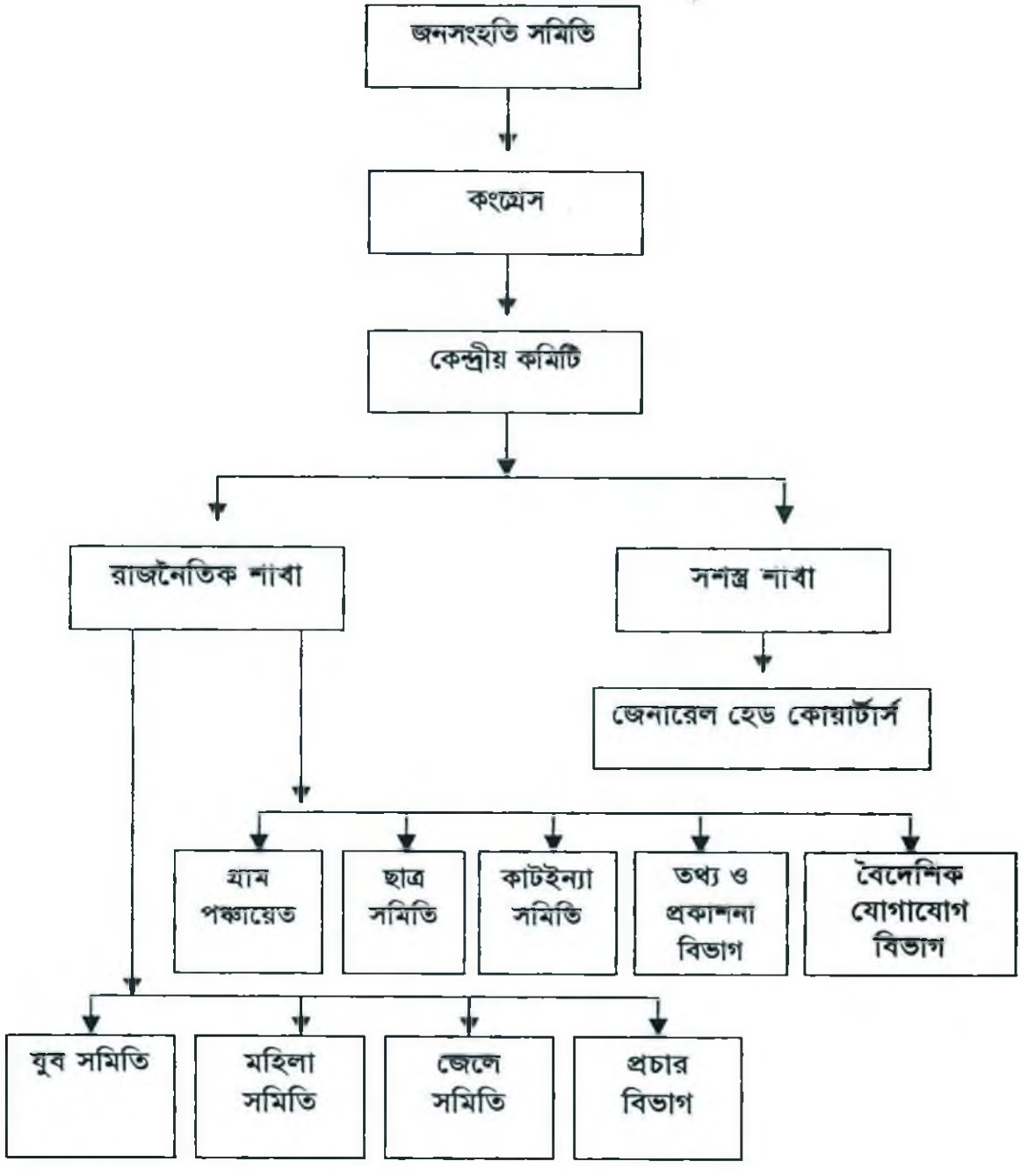

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের মত জনসংহতি সমিতিরও রয়েছে বিস্তৃত কাঠামো। জেলা পর্যায়ের নেতাদের দিয়ে গঠিত কংগ্রেস মূল নীতি নির্ধারণী অঙ্গ। প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর কংগ্রেস নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচনের জন্য সভায় মিলিত হয়। ত্রিবার্ষিক কংগ্রেসে পাস হওয়া সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি ম্যান্ডেট লাভ করে।

রাজনৈতিক ও সশস্ত্র শাখার নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশনা প্রদান এবং তত্ত্বাবধানসহ সকল রাজনৈতিক ও সশস্ত্র কর্মকান্ড পরিচালনা করা। রাজনৈতিক শাখা মূলতঃ বিভিন্ন ধরণের তৃণমূল সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচার ও প্রকাশনার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। জনসংহতি সমিতির তৃণমূল সংগঠনের কাজ ঃ

গ্রাম পঞ্চায়েত স্থানীয় প্রশাসন দেখা শোনা তথা উপজাতীয়দের চুরি, ডাকাতি, রাহাজানী, জমি সংক্রান্ত বিরোধ, অসামাজিক কার্যকলাপ প্রভৃতি সংক্রান্ত সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করে থাকে। কোন বিশেষ জটিল মামলা নিষ্পত্তিতে বা রায় প্রদানে গ্রাম পঞ্চায়েত অপরাগ হলে পঞ্চায়েত সরাসরি ঐ মামলা সশস্ত্র শাখার নিকট অর্পণ করে এবং সশস্ত্র শাখা সশস্ত্র উপায়ে ঐ মামলা নিষ্পত্তি করে থাকে। বিবাদ নিষ্পত্তিকরণের সাথে সাথে গ্রামের লোকজন জনসংহতি সমিতির উদ্দেশ্য এবং আদর্শের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা, পার্টির চাঁদা আদায়ে সাহায্য করা, খবরাখবর আদান প্রদান করা, নতুন কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করা প্রভৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের পর থেকে কোন বিচার-আচারের জন্য উপজাতীয় জনগণের থানার পুলিশ, হাকিম তথা

Dhaka University Institutional Repository

কোন সরকারী আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করা ছিল নিষিদ্ধ। এই আইন কেউ বরখেলাপ করলে তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান ছিল। বস্তুতঃ গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল জনসংহতি সমিতি তথা শান্তি বাহিনীর পক্ষ থেকে পরিচালিত সরকার বা প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়। যুব সমিতি সাধারণ লোকদের মাঝে আন্দোলন পরিচালনা করে থাকে এবং সশস্ত্র ক্যাডার এর জন্য সদস্য সংগ্রহ করে থাকে। ছাত্র সমিতি ও মহিলা সমিতিও নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে থেকে সমিতির কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের কাজ করে। কাটইন্যা সমিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা যা অরণ্য হতে বাঁশ ও কাঠ সংগ্রহকারী ব্যবসায়ীদের নিকট হতে চাঁদা আদায় তদারকী করে থাকে। তথ্য ও প্রকাশনা এবং প্রচার বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে নিজস্ব তথ্য প্রকাশ ও প্রচার কার্য পরিচালনা করে থাকে। বৈদেশিক যোগাযোগ বিভাগ আন্তর্জাতিক সংগঠন, বিভিন্ন দেশের সাথে এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমিতির লক্ষ্য, অবস্থান ও উপজাতীয় সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যায়। বিশেষকরে ভারতের সাথে বিভিন্ন সাহায্য ও সম্পর্ক রক্ষায় এই শাখা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত সমিতির পঞ্চম কংগ্রেস জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) ও চন্দ্র শেখর চাকমাকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করে যে কমিটি গঠন করা হয় সে কমিটির সাথে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত সমিতির ৬ষ্ঠ কংগ্রেসও পূর্বের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককেসহ সহ পদে বহাল রেখে ৩৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কংগ্রেসে সমিতির সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী' বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ শান্তিবাহিনীর জন্ম, সাংগঠনিক কাঠামো এবং কার্যক্রম ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয়দের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধা আদায়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' আত্মপ্রকাশের দশ মাসের মাথায় 'শান্তিবাহিনী' নামে একটি সশস্ত্র সংগঠন জন্ম লাভ করে। তাই স্বভাবতই প্রশ্নজাগে কেন এই সংগঠনের জন্ম? এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী? এবং এর নেতৃত্বের ধরণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে পদ্ধতিগত অবস্থান কী? ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব নিম্নে আলোচনা করা হল ঃ

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মংরাজা মং প্রু চাঁই এর নেতৃত্বে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কাছে যে চার দফা দাবী পেশ করা হয়েছিল তার উত্তরে বঙ্গবন্ধু পরবর্তী সময়ে উপজাতীয়দেরকে বৃহত্তম বাঙালী জাতীয়তাবাদে নিজেদের অস্তিত্ব বিকাশ সাধন করার যে পরামর্শ দেন তাতে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ হন। ফলে জনসংহতি সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে লাগলেন যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কোন রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ইতিহাস বিশ্লেষণ করে উল্লেখ করেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে তাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ এবং নৃ-জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিকাশ লাভের নিমিত্তে অস্ত্র হাতে সংগ্রাম করতে হয়েছে। একদিকে এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে অন্য দিকে দাবী আদায়ের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে মনে করে মি. লারমা ও তার সহযোগীবৃন্দ রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামের পাশাপাশি সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে মিঃ লারমা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উপজাতীয় সদস্যদের তালিকা তৈরি করে সংগ্রাহাভিযান পরিচালনা করেন। এরই বাস্তবায়নে লারমা পার্বত্য রাজাকার, মুজাহিদ ও সিএএফ এর কোম্পানি কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডারদেরকে নিয়ে গোপন মিটিং (সভা) করেন। কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন- দেবময় চাকমা (রাজাকার), বিজয় সিংহ চাকমা (মুজাহিদ) এবং সুদত্ত চাকমা (সিএএফ)। এ সকল কমান্ডাররা তাদের অনুগত সদস্যদের অস্ত্রশস্ত্রসহ সংগঠিত করতে লাগলো। শুধু তাই নয় পাশাপাশি লারমা তীর্থ ভ্রমণের নামে ভারতে গিয়ে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা (RAW) এর উর্ধ্বতন কর্মর্তাদের সাথে দেখা করে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার প্রেক্ষাপটে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালার লক্ষে ১৯৭২ সালের নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসেই সশস্ত্র ট্রেনিং শুরু হয়। প্রথম অফিসার দলকে প্রশিক্ষণ দেয়ার পর সে বছরই এম. এন. লারমা তার ভাই সন্তু লারমা ও নলিনী রঞ্জন চাকমাকে নিয়ে নিজ বাড়ি পানছড়িতে সশস্ত্র গ্রুপ গড়ে তোলার খসড়া প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারি গঠিত হয় জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী'।[২৪] এক তথ্যসূত্র থেকে জানা গেছে, 'শান্তিবাহিনী' তথা জনসংহতি সমিতির প্রধান সামরিক কার্যালয় স্থাপন করা হয় খাগড়াছড়ি জেলার দিঘিনালা থানার বাঘাই (ছদ্মনাম) নামক এক স্থানে। উল্লেখ্য যে, শান্তিবাহিনী জনসংহতি সমিতির মিলিটারী কমিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি সশস্ত্র গ্রুপ যার কর্মকান্ড জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স (জিএইচ কিউ) হতে পরিচালিত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

একজন ফিল্ড কমান্ডার 'জিএইচকিউ' এর প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। শান্তিবাহিনীর বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নে দেয়া হলো ঃ

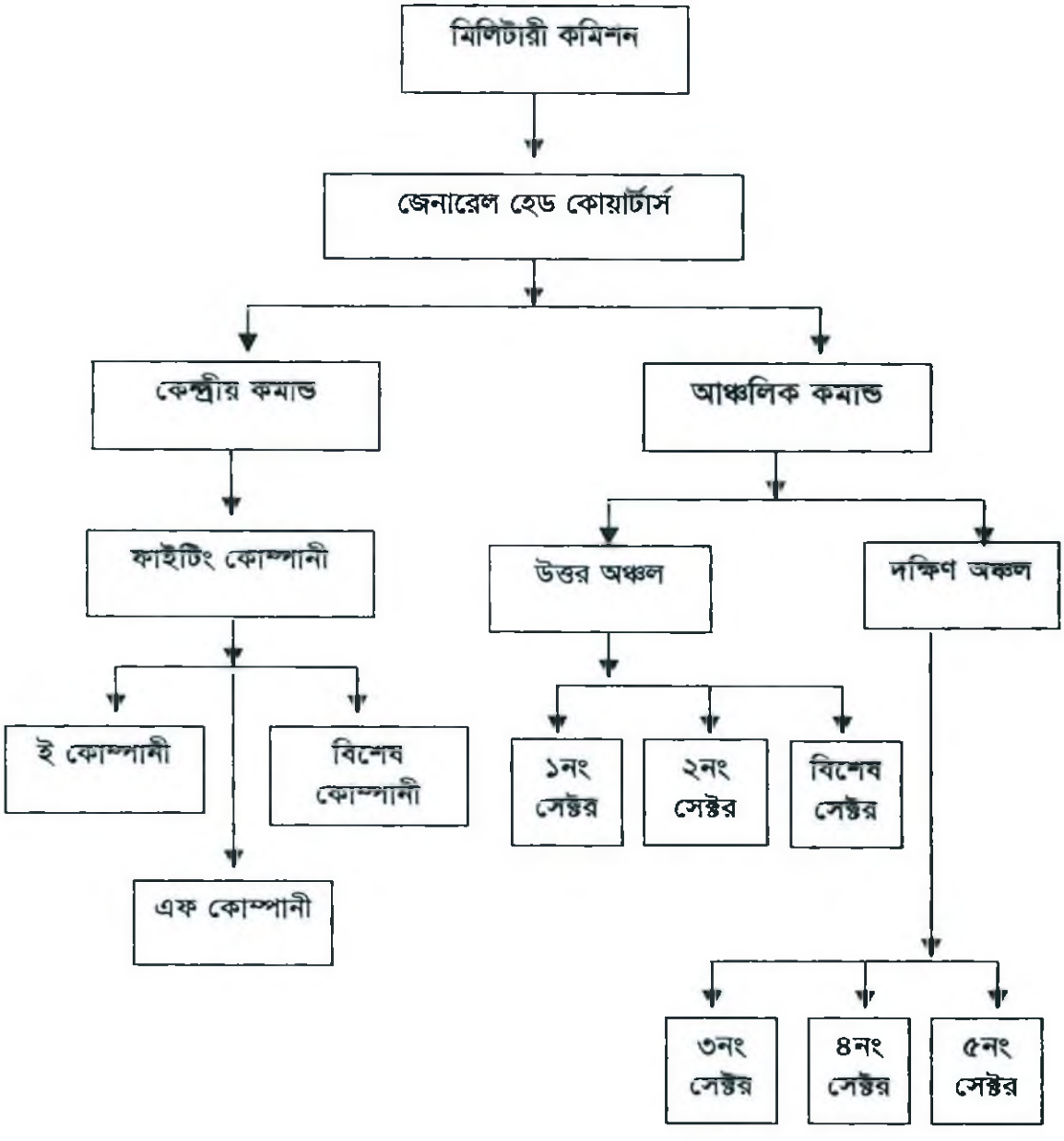

Dhaka University Institutional Repository

☆ অপারেশনাল অঞ্চল ও সেক্টরসমূহ ঃ[২৫]

অপারেশন চালানোর সুবিধার জন্য শান্তিবাহিনী সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে দুটি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। যথা- উত্তর অঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চল। কর্ণফুলী নদীর উত্তর পার্শ্বকে 'উত্তর অঞ্চল' এবং দক্ষিণ পার্শ্বকে 'দক্ষিণ অঞ্চল' হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। অঞ্চলগুলিকে পুনরায় প্রশাসনিক সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় সেক্টরে ভাগ করা হয়। উত্তর অঞ্চলকে ভাগ করা হয় তিনটি সেক্টরে, যথা ঃ ১নং সেক্টর, ২নং সেক্টর ও বিশেষ সেক্টর এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ভাগ করা হয় তিনটি সেক্টরে যথা ঃ ৩নং সেক্টর, ৪নং সেক্টর ও ৫নং সেক্টর। প্রতিটি সেক্টর আবার কতগুলো জোনে বিভক্ত। নিচে সেক্টর ও জোনগুলোর পরিচয় দেয়া হলো ঃ

(ক) উত্তর অঞ্চল — **উত্তর অঞ্চলের আওতাধীন ১নং সেক্টরের অধীনস্থ জোনগুলি হচ্ছে ঃ**

(১) ওয়াগা জোন — চন্দ্রঘোনা থানার উত্তরাংশ এবং কাউখালী থানার দক্ষিণাংশ।

(২) ইছামতি জোন — কাউখালী থানার পশ্চিমাংশ, লক্ষীছড়ি থানার পূর্বাংশ এবং মানিকছড়ি থানা।

(৩) বুড়িঘাট জোন — নানিয়ার চর থানার পশ্চিমাংশ ও কাউখালী থানার পূর্বাংশ।

(৪) গুঁইমারা জোন — রামগড় থানা, মাটিরাঙা থানার দক্ষিণাংশ এবং মানিকছড়ি থানার কিছু অংশ।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর অঞ্চলের আওতাধীন ২নং সেক্টরের অধীনস্থ জোনগুলি হচ্ছে ঃ

(১) নানিয়ারচর জোন	সমগ্র নানিয়ার চর থানার উত্তরাংশ এবং মহালছড়ি থানার দক্ষিণাংশ।
(২) লংগদু জোন	সমগ্র লংগদু থানা।
(৩) রাংগাপানি মেরুং জোন	দীঘিনালা থানার দক্ষিণাংশ এবং বাঘাইছড়ি থানার পশ্চিমাংশ।
(৪) কমলছড়ি জোন	মহালছড়ি থানার উত্তরাংশ এবং খাগড়াছড়ি থানার দক্ষিণাংশ।

উত্তর অঞ্চলের আওতাধীন বিশেষ সেক্টরের অধীনস্থ জোনগুলি হচ্ছে ঃ

(১) পানছড়ি জোন	পানছড়ি থানার পূর্বাংশ এবং খাগড়াছড়ি থানার উত্তরাংশ।
(২) দীঘিনালা জোন	দীঘিনালা থানার উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম অংশ এবং খাগড়াছড়ি থানার পূর্বাংশ।
(৩) কাসালং জোন	বাঘাইছড়ি থানার উত্তর ও পুর্ব অংশ এবং দীঘিনালা থানার রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দক্ষিণ অঞ্চল

দক্ষিণ অঞ্চলের আওতাধীন ৩নং সেক্টরের অধীনস্থ জোনগুলি হচ্ছে ঃ

(১) নারা জোন	বান্দরবা থানার উত্তরাংশ এবং রাজস্থলী থানা।
(২) তারচা জোন	বান্দরবান থানার দক্ষিণাংশ এবং লামা থানার উত্তরাংশ।
(৩) গাইন্দা জোন	বিলাইছড়ি থানার পশ্চিম অংশ রাঙামাটি কোতোয়ালী থানার দক্ষিণাংশ এবং জুরাছড়ি থানার পশ্চিমাংশ।

দক্ষিণ অঞ্চলের আওতাধীন ৪নং সেক্টরের অধীনস্থ জোনগুলি হচ্ছে ঃ

(১) লামা জোন	লামা থানার দক্ষিণাংশ এবং সমগ্র নাইখংছড়ি থানা।
(২) আলীকদম জোন	সমগ্র আলীকদম থানা
(৩) মধু জোন	থানচি থানার পূর্বাংশ।
(৪) সাংগু জোন	থানচি থানার দক্ষিণাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ অঞ্চলের আওতাধীন ৫নং সেক্টরের অধীনস্থ জোনগুলো হচ্ছে ঃ

(১) সুভলং জোন	বরকল থানার পশ্চিমাংশ, নানিয়ারচর থানার দক্ষিণাংশ এবং রাঙামাটি সদর থানার পূর্বাংশ।
(২) রাইখ্যাং জোন	সমগ্র বিলাইছড়ি থানা।
(৩) বগা জোন	রোয়াংছড়ি থানার পূর্বাংশ।
(৪) হরিণা জোন	বরকল থানার উত্তর এবং পূর্বাংশ।

১৯৮১-৮৪ সালে বিরাজমান শান্তিবাহিনীর আভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব অবসান হলে জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি সেক্টর ও জোনগুলোর নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'ডিসট্রিক্ট' ও 'এরিয়া' নামে নূতনভাবে নামকরণ করে। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে উদাহরণস্বরূপ নূতন নাম ব্রাকেটে দেওয়া হল। নিম্নে সেক্টর ও জোনগুলোর পরিবর্তিত নাম দেয়া হল ঃ উত্তর অঞ্চল ১নং সেক্টর (যশোর ডিস্ট্রিক্ট) ২নং সেক্টর (বগুড়া ডিস্ট্রিক্ট) বিশেষ সেক্টর (সিলেট ডিস্ট্রিক্ট) দক্ষিণ অঞ্চল ৩নং সেক্টর (কুমিল্লা ডিস্ট্রিক্ট) ৪নং সেক্টর (ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট) ৫নং সেক্টর (রংপুর ডিস্ট্রিক্ট)

জেনারেল হেডকোয়ার্টার দুটি কমান্ডের মাধ্যমে সশস্ত্র তৎপরতা পরিচালনা করে থাকে- কেন্দ্রীয় কমান্ড এবং আঞ্চলিক কমান্ড যা ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড। কেন্দ্রীয় কমান্ডের আওতায় রয়েছে তিনটি ফাইটিং কোম্পানী যাদের কোন

Dhaka University Institutional Repository

সুনির্দিষ্ট এলাকা নেই, বরং কেন্দ্রীয় কমিটি বিশেষ প্রয়োজনে এদের ব্যবহার করে থাকে। আঞ্চলিক বাহিনীগুলো অধিকতর সক্রিয় এবং জেলা কমান্ডের নির্দেশ মোতাবেক জেলাগুলোতে অপারেশন পরিচালনা করে থাকে।

দক্ষিণ অঞ্চলের ৩, ৪ এবং ৫নং সেক্টরের সদর দপ্তর উপ-কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং দক্ষিণ অঞ্চলকে কমান্ড পোস্ট বি নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কমান্ড পোস্ট বি এর সদর দপ্তরের নিরপত্তার জন্য ১০০ জন সশস্ত্র সৈন্য সর্বদা নিয়োজিত থাকতো।

মূলতঃ বিশেষ সেক্টর ব্যাতিত সেক্টরগুলো অপারেশনাল এরিয়া বা যুদ্ধ ময়দান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সেজন্য ই এবং এফ কোম্পানীর সৈন্যদেরকে সারাবছর ধরে সামরিক কলাকৌশল প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হতো। যুদ্ধ ছাড়া তাদের অন্য কোন দায়িত্ব ছিল না। গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ, রেইড, অ্যাটাক, অ্যামবুশ ইত্যাদি ছিল তাদের কাজ। অবসর সময়ে বিভিন্ন দেশের গিরিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত লেকচার এবং বই পড়ানো হতো। তাদের জন্য ছুটি খুবই কম ছিল। এ কারণেই বিশেস সেক্টর ব্যতিত অন্যান্য সেক্টরের সৈন্যদেরকে সবসময় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। বিশেষ সেক্টরে মূলতঃ অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুদ থাকতো।

বর্তমানে খাগড়াছড়ি থেকে ৪৫ মিনিটে সড়ক পথে দীঘিনালা উপজেলা সদর পৌঁছা যায়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে থানা সদর দীঘিনালা ছিল বেশ দুর্গম। এই থানারই উত্তরাংশে স্থাপিত হয় জনসংহতি সমিতির প্রধান কার্যালয় এবং সামরিক শাখা শান্তিবাহিনীর হেড কোয়ার্টার বা সদর দপ্তর।

Dhaka University Institutional Repository

☆ শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব ঃ

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের ১৪ জুন অর্থাৎ আত্মঘাতি সংঘর্ষ পর্যন্ত শান্তিবাহিনী যে নেতৃত্ব ছিল তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

১.	চেয়ারম্যান	:	মানেবন্দ্র নারায়ণ লার্মা
২.	ভাইস চেয়ারম্যান	:	ভবতোষ দেওয়ান
৩.	ফিল্ড কমান্ডার	:	সন্তু লার্মা
৪.	বিশেষ কোম্পানী কমান্ডার	:	মিঃ বিজয় সিংহ (মেজর পুঁই)
৫.	ই কোম্পানী কমান্ডার	:	মিঃ স্নেহ রঞ্জন চাকমা (মেজর ধ্রুব)
৬.	এফ কোম্পানী কমান্ডার	:	মিঃ লক্ষী প্রসাদ চাকমা (মেজর দেবাশীষ)
৭.	১নং সেক্টর কমান্ডার	:	মিঃ দেবজ্যোতি চাকমা (মেজর দেবেন)
৮.	২নং সেক্টর কমান্ডার	:	মিঃ উষাতন চাকমা (মেজর সমীরণ)
৯.	৩নং সেক্টর কমান্ডার	:	মিঃ তাতীন্দ্রলাল চাকমা (মেজর পেলে)
১০.	৪নং সেক্টর কমান্ডার	:	মিঃ সুদত্ত চাকমা (মেজর রক্সিও)
১১.	৫নং সেক্টর কমান্ডার	:	মিঃ প্রশান্ত চাকমা (মেজর জুলো)
১২.	বিশেষ সেক্টর কমান্ডার	:	মিঃ ত্রিভঙ্গীল চাকমা (মেজর পলাশ)

Dhaka University Institutional Repository

☆ শান্তিবাহিনীর জনশক্তি ও প্রশিক্ষণ ঃ

১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত শান্তিবাহিনীতে ব্যাপকহারে রিক্রুটমেন্ট চলতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে, প্রাণভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়া সশস্ত্র রাজাকাররা শান্তিবাহিনীতে যোগ দেয়। ভারতে চলে যাওয়া শরণার্থীরাও কিছু কিছু যোগ দেয় বিদ্রোহী বাহিনীতে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা এক্ষেত্রে উৎসাহ ও প্রেরণা দানকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মানবেন্দ্র লার্মা এবং সন্তু লার্মা উভয়েই ছিলেন শিক্ষক (মুৎসুদ্দী, পৃঃ ১২ এবং সিদ্ধার্থ, চাকম, পৃঃ ১০৫-১০৬)।

শান্তিবাহিনীর প্রথম প্রশিক্ষক ছিলেন নালিনী রঞ্জন চাকমা ওরফে মেজর অফুরন্ত। সন্তু লারমা তাকে পার্টিতে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করতে সক্ষম হলে প্রথমেই তাকে প্রশিক্ষণ চালানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং বিনিময়ে তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় পার্টি হতে বহন করা হবে বলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়ে। এরপর থেকেই তিনি শান্তিবাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তার সহযোগী ছিলেন অপর প্রাক্তন ইপিআই এর হাবিলদার মৃত অমৃত লাল চাকমা ওরফে ক্যাপ্টেন অসাধ্য (বলি ওস্তাদ)। এখানে উল্লেখ্য যে মেজর অফুরন্ত কেবলমাত্র শান্তিবাহিনীর অফিসার শ্রেণীকেই প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিলেন। তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারগণই পরবর্তীতে শান্তিবাহিনীর সৈনিক পর্যায়ের সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্নস্থানে প্রশিক্ষণ প্রদান করতো। প্রথম পর্যায়ে সমস্ত অফিসারকে চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয় মহালছড়ি থানার দাদকুপ্পা (বা দাদকুপিয়া) জুতে। প্রশিক্ষণের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে সন্তু লারমা তাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতেন। এই কেন্দ্রেই শান্তিবাহিনীর প্রথম দুটি অফিসার দল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসারগণই পরবর্তীতে পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এরাই পার্টির কর্মতৎপরতা ও নীতিমালা নির্ধারণে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে।

☆ **প্রথম ব্যাচ ঃ**

১৯৭২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মেজর অফুরন্ত মহালছড়ি থানার দাদকুপিয়াতে শান্তিবাহিনীর প্রথম দলকে চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এই দলের সদস্যরা ছিল অফিসার র‍্যাঙ্কের এবং সংখ্যা ছিল দশ। প্রশিক্ষণসূচী এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি এই ক্যাম্পেই প্রণয়ন করা হয়। দাদকুপ্পা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ লাভকারী প্রথম দলের সদস্যরা ছিলেন :

ক) মেজর পরে (লেঃ কর্ণেল) প্রশান্ত কুমার চাকমা (জুলু)(মৃত); (খ) পরিমল চন্দ্র চাকমা (পাভেল) পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের চাকুরী লাভ করেন; (গ) মেজর গৌতম চাকমা (অশোক)-পরবর্তীতে লারমা গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য; (ঘ) মেজর সুদত্তা চাকমা (রক্সিও)-পরবর্তীতে প্রীতি গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য; (ঙ) মেজর দেবজ্যোতি চাকমা (দেবেন)-পরবর্তীতে প্রীতি গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য এবং একসময় উক্ত গ্রুপের ফিল্ড কমান্ডার ছিলেন; (চ) প্রভাত কুমার চাকমা দীঘিনালা থানার মেরুং ইউপি'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পরে নিষ্ক্রিয়; (ছ) ভদ্রসেন চাকমা দীঘিনালা থানার বাবুছড়া হাইস্কুলের শিক্ষক, পরবর্তীতে আত্মসমর্পণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন; (জ) টুনটু মনি চাকমা রাঙামাটি জেআইসি সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করাকালীন আত্মহত্যা করেন; (ঝ) সুজিত চাকমা দুর্নীতি ও অসামাজিক কার্যকলাপের দরুণ শান্তিবাহিনীর সদস্য কর্তৃক নিহত হন বলে কথিত এবং (ঞ) জোগেন্দ্র চাকমা পরবর্তীতে নিষ্ক্রিয়।

☆ **দ্বিতীয় ব্যাচ ঃ**

উপরের প্রথম গ্রুপটির প্রশিক্ষণ শেষ হলে তের জনের দ্বিতীয় আরেকটি গ্রুপ এক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হল :

ক) মেজর রূপায়ন দেওয়ান (রিপ) লারমা গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য ও ভারপ্রাপ্ত ফিল্ড কমান্ডার; (খ) মেজর উষাতন তালুকদার (সমীরণ) লারমা গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য, পরে অপর নাম হয় মলয়; (গ) মেজর বিজয় সিংহ চাকমা (সুজয়) প্রীতি গ্রুপের সদস্য ও বৈদেশিক যোগাযোগের দায়িত্বে নিয়োজিত; (ঘ) মেজর লক্ষ্মীপ্রসাদ চাকমা (দেবাশীষ) লারমা গ্রুপের সদস্য; (ঙ) মেজর তাতিন্দ্র লাল চাকমা (তালুকদার) লারমা গ্রুপের সমর্থক, পরে নাম হয় পেলে; (চ) মেজর ধীর কুমার চাকমা (শৈলেন) লারমা গ্রুপের সদস্য; (ছ) ক্যাপ্টেন সুধন চাকমা (সরেজিৎ) প্রীতি গ্রুপের প্রভাবশালী সদস্য (জ) ক্যাপ্টেন বিভূ রঞ্জন চাকমা (দীপু) এক পর্যায়ে আত্মসমর্পণ করেছেন; (ঝ) মেজর চাবাই মগ (মং হ্লা উ) সন্তু লারমার সাথে গ্রেফতার হন ও ছাড়া পান। পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনযাপন করাকালে ১৯৮৭ সালের শুরুর দিকে শান্তিবাহিনীর হাতে প্রথমে অপহরণ ও নিহত হন বলে বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়; (ঞ) বকুল চন্দ্র চাকমা পরে এক সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক; (ট) রনধীর চাকমা বর্তামনে নিষ্ক্রিয়; (ঠ) লেঃ ভগবান চন্দ্র চাকমা (গভ) এক সময় ধৃত এবং (ড) মেজর ত্রিভঙ্গীল দেওয়ান (পলাশ) প্রীতি গ্রুপের প্রভাবশালী নেতা। পরে নাম হয় প্রখর।

☆ জোন লিডারস্ কোর্স ঃ

১৯৭৩ সালের শেষ দিকে শুরু হয় জোন লিডারস কোর্স (জেডএলসি)। এই কোর্সের মেয়াদ ছিল দুই মাস। জেড এল সি প্রশিক্ষণে যারা সন্তোষজনকভাবে সফল হয় তাদেরকে জোন কমান্ডার অথবা জোন পলিটিক্যাল সেক্রেটারী হিসাবে বিভিন্ন জোনে জোনে নিয়োগ করা হয়। এসকল ব্যক্তির দায়িত্বে থাকতো সংশ্লিষ্ট জোন। পার্টির বাছাইকৃত সদস্যরাই এসকল কোর্সে প্রশিক্ষণ পেত এবং তারা সকলেই রাঙামাটি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করতো। এভাবে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মোট ১০টি জেড এলসি কোর্স চলে যেগুলোতে প্রায় তিনশত অফিসার প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রশিক্ষণ লাভের পর এরা বিভিন্ন দপ্তরে, এলাকায়, শাখায় যার যার কাজে নেমে পড়ে। এরপর শুরু হয় জুনিয়র ট্রেনিং কোর্স (জেটিসি) ১৯৭৬-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত।

☆ সদস্য সংখ্যার মূল্যায়ন ঃ

১৯৮৪ সালের এক মূল্যায়ন হতে জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর হতে উক্ত সময়কাল পর্যন্ত শান্তিবাহিনীতে বিভিন্ন সেক্টর ও জোনে প্রায় ৩৫০০ লোককে সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়া হয়েছে যারা

Dhaka University Institutional Repository

কমপক্ষে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। তবে এদের মধ্যে প্রায় ১৫০০ লোক নিষ্ক্রিয় হয়ে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। নিয়মিত সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী ছাড়াও প্রত্যেক এলাকার স্থানীয় যুবক সম্প্রদায়কে মিলিশিয়া ট্রেনিং দেওয়া হয়। কমপক্ষে ১০,০০০ যুবক এক সপ্তাহের মিলিশিয়া প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮ সালের ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা চলাকালে শান্তিবাহিনী তাদের নিয়মিত সদস্য সংখ্যা প্রায় আট হাজারেরও অধিকে উন্নীত করতে সক্ষম হয়। ঐরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধের বাংলাদেশ সরকার জোরালো সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শান্তিবাহিনীতে ব্যাপক দলত্যাগের ঘটনা ঘটে এবং নিয়মিত বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে।

☆ শান্তিবাহিনীর সদস্যদের ব্যবহৃত অস্ত্র

একটি তালিকা ঃ

১. রাইফেল, সাব-মেশিন গান, লাইট মেশিন গান (চীনা)

২. পুরানো মডেলের রাইফেল এবং লাইট মেশিনগান (বৃটিশ)

৩. রাইফেল, কার্বাইন এবং লাইট-মেশিন গান (ভারতীয়)

৪. জার্মানী এবং চেকোশ্লোভাকিয়া-তে নির্মিত রাইফেল

৫. সিঙ্গেল এবং ডাবল ব্যারেল শট গান

৬. হ্যান্ড গ্রেনেড

৭. ২ ইঞ্চি মর্টার ও ৬০ মিলিমিটার মর্টার

৮. বিস্ফোরক

Dhaka University Institutional Repository

☆ শান্তিবাহিনীর পরিকল্পিত তৎপরতা ঃ

১৯৭৬ সাল থেকে শান্তিবাহিনী পরিকল্পিত তৎপরতা শুরু করে। সামরিক তৎপরতা অব্যাহত থাকা অবস্থাতেই ১৯৮২ সালে 'জনসংহতি সমিতি' ও 'শান্তিবাহিনী' আদর্শগত কারনে দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে মার্কসবাদী 'লারমা গ্রুপ', অন্যদিকে প্রীতিকুমার চাকমার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী 'প্রীতিগ্রুপ'। পরবর্তীকালে দুটি গ্রুপ পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়। ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের হামলায় জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান ও শান্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এমএন লারমা তাঁর ৮জন সহযোগীসহ নিহত হন।[২৬] এম এন লারমার মৃত্যুর পর লারমা গ্রুপের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এম এন লারমার ছোট ভাই জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। এমতাবস্থায় প্রীতি গ্রুপ বিভিন্ন জোন ও সেক্টর দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। দখল ও পাল্টা দখলের খেলায় উভয় গ্রুপের বহু সদস্য নিহত হতে থাকে। নিজেদের মধ্যে এরূপ ভ্রাতৃঘাতি কর্মকান্ডের দরুণ বহু কর্মীর অকাল মৃত্যুতে তরুণ কর্মীদের মাঝে অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। ফলে বহু কর্মী নিষ্ক্রিয় বা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করার প্রবণতা দেখা দেয়।

শান্তিবাহিনীর অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রীতি গ্রুপ ও লারমা গ্রুপের নেতাদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। সরকার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেয়া হয় যে, পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এমতাবস্থায় প্রীতি গ্রুপের দুই কর্ণধার প্রীতিকুমার চাকমা ও ভবতোষ দেওয়ান ব্যতীত অধিকাংশ নেতা ও কর্মকর্তারা

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের অনুসারী সহ ২৩৩ জন সদস্য ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। বলা যায় যে তখন থেকে প্রীতি গ্রুপ বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ১৯৮৫ সালের মে মাসে লারমা গ্রুপকে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) নেতৃত্বে ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠিত করা হয়। ইতিমধ্যে সন্তু লারমাকে জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান নিয়াগ করে ফিল্ড কমান্ডারের দায়িত্বও তার উপর অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি তথা গ্রুপর মধ্যে ক্ষমতাগত কোন্দলের কারণে একসময় উষাতন তালুকদার (ছদ্মনাম- মেজর সমীরণ) কে ফিল্ড কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়। তার কমান্ডো বাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। হামলা, গুপ্ত হামলায় পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি আবার অশান্ত হয়ে ওঠে।

৪.৬ অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর পার্বত্য পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। এই সময় দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ছিল নাজুক অবস্থানে। ফলশ্রুতিতে শান্তি বাহিনী এই সময়টিকে কাজে লাগায়। ১৯৭৬ সাল থেকে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ বা ইন্সার্জেন্সি শুরু হয়। সূচনায় শান্তি বাহিনীর টার্গেট ছিল থানা আক্রমণ করে অস্ত্রশস্ত্র লুট, পুল কালভার্ট ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন এবং বিত্তশালী লোকজন ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করা।

Dhaka University Institutional Repository

যতটুকু জানা যায় ১৯৭৬ সালের ১৮ই জুলাই হতে শান্তি বাহিনী বিলাইছড়ি থানার তক্তানালার কাছে মালুমিয়া পাহাড়ে সকাল ১১টায় রাঙামাটি হতে আগত পুলিশ পেট্রোল পার্টির উপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের সূচনা করে। এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের যুদ্ধ ও হানাহানিতে যে মানবিক ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়েছে তাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে পার্বত্য ভূমির শ্যামল প্রান্তর, অরণ্য জনপদ। পাহাড়ি ঝরণাধারায় প্রবাহিত হয়েছে উষ্ণ রক্তস্রোত। নাশকতা ও বর্বরতার বিচারে ভিয়েতনামের মাইলাই হত্যাকান্ডকেও হার মানিয়েছে। প্রতিশোধমূলক এই সমস্ত হত্যাকান্ড ও অগ্নিসংযোগে পাহাড়ি ও বাঙালি কেউই রেহাই পায়নি। পারস্পরিক হানাহানি ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয়েছে অসংখ্য পাহাড়ি গ্রাম ও বাঙালি অধ্যুষিত গুচ্ছগ্রাম। জীবনহানি ছাড়াও শত শত কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। শান্তি বাহিনীর ইন্সার্জেন্সি প্রতিহত করতে সরকার ও কাউন্টার ইন্সার্জেন্সির বেছে নেয়। ইন্সার্জেন্সী ও কাউন্টার ইন্সার্জেন্সী কী? এটি একটি ইংরেজি শব্দ যার উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ নেই। সঠিকভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন তবে অনেকটা এইভাবে বলা যায়, একটি নতুন বা ভিন্নধর্মী সমাজ বা রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি দল বা জনগোষ্ঠী কর্তৃক একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার বা একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সশস্ত্র সমন্বিত পদক্ষেপ বা সংগ্রামকে ইন্সার্জেন্সী বলা হয়। যখন ইন্সার্জেন্সী চালু হয়, তখন প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের পদক্ষেপগুলোকে কাউন্টার ইন্সার্জেন্সী বলে।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

ইন্সার্জেন্সী ও কাউন্টার ইন্সার্জেন্সীতে ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কত লোক নিহত, আহত ও নিখোঁজ হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ সেনাবাহিনীর বরাত দিয়ে তার প্রকাশিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরণাধারা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "১৯৯৭ এর মে পর্যন্ত মারা গেছে ১৭৩জন সৈনিক, ৯৬জন বিডিআর, ৪১জন পুলিশ এবং আরও কয়েকজন, সব মিলিয়ে ৩৪৩ জন, আহত হয়েছে ৩৭৩ জন, ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে ১৫৬ জন।" অসামরিক ব্যক্তিদের প্রসেঙ্গ তিনি যে হিসেব দিয়েছেন তা হলো, "এ সময়ে অসামরিক ব্যক্তিরাই মরেছে বেশি, বাঙালি ১০৫৪জন, উপজাতীয় ২৩৭জন, আহত হয়েছে ৬৮৭জন বাঙ্গালি আর ১৮১জন উপজাতীয়; অপহৃত হয়েছে ৪৬১জন বাঙালি আর ২৮০জন উপজাতীয়। এ পরিসংখ্যানটি সামরিক বাহিনীর। শান্তিবাহিনীর পরিসংখ্যানে হয়তো উপজাতীয় মৃতের সংখ্যা ও আহতের সংখ্যা কয়েক গুণ বাড়বে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯১ সালের আগস্ট পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর হাতে অসামরিক পাহাড়ি ও বাঙালি যারা হতাহত হয়েছে এবং যাদের অপহরণ করা হয়েছে, তাদের একটি চিত্র নিম্নে সারণির মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সময়	নিহত		আহত		অপহরণ	
	বাঙালী	উপজাতি	বাঙালী	উপজাতি	বাঙালী	উপজাতি
১৯৮০	৮৭	৮	৭৫	৫	৫৭	৭
১৯৮১	৪২	২	২৮	২	৩	১২
১৯৮২	১৬	৭	২০	--	৫১	১৮
১৯৮৩	৮	--	৮	৩	১৫	১
১৯৮৪	১০৮	৭	৪৫	৮	১৮	২৭
১৯৮৫	১১	১৪	১৯	৮	২৫	১৯
১৯৮৬	২৪৮	৩৩	১১৮	১৬	৩৩	৪
১৯৮৭	১১৭	১৯	৬৭	৯	১৭	৮
১৯৮৮	১২৮	১৬	৬৫	১৪	১৩১	২৭
১৯৮৯	৭২	৪৭	১৩৮	৫৭	২২	২৮
১৯৯০	৪৭	২০	৩৮	১২	১৮	২২
১৯৯১	৬৮	১৫	৩৬	১৮	২১	৩২
মোট	৯৫২	১৮৮	৬৫৬	১৫২	৪১১	২০৫

তথ্যসূত্র ঃ সমবায়ি নথি, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬-এর পরবর্তী হতে ১৯৯১ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর হাতে শান্তিবাহিনীর সদস্যদের হতাহত ও আটক এর একটি সরকারী পরিসংখ্যান নিম্নে সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো ঃ

বছর	নিহত	আহত	আটক
১৯৭৯ পর্যন্ত	৫২	০৪	--
১৯৮০	২৩	১৫	--
১৯৮১	০৮	০৫	--
১৯৮২	০৮	০৭	--
১৯৮৩	০৩	--	--
১৯৮৪	২১	১০	--
১৯৮৫	১১	০৫	--
১৯৮৬	০৫	০২	২৯৯
১৯৮৭	১০	০৮	২৫৪
১৯৮৮	০৯	০২	৩০১
১৯৮৯	২৯	০৫	৩৯০
১৯৯০	৪০	০৮	৩৫৫
১৯৯১ ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত	১৭	১৩	২৯৩
মোট	২৩৭	৮৪	১৮৯২

তথ্যসূত্র ঃ সরকারি নথি, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত তথ্য/পরিসংখ্যান ছাড়াও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা ও তথ্যভিত্তিক মহলের ধারণা ১৯৭৬-৯৭ পর্যন্ত সময়সীমার ভেতরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি ও উপজাতীয় মিলে ১৫-২০ হাজারের মতো মানুষ নিহত ও আহত হয়েছে এবং অপহৃত ও নিখোঁজ হয়েছে দুই হাজারেরও অধিক মানুষ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে প্রায় ৫ শতাধিক। অন্যদিকে "বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন"-এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ১৯৮০ সাল হতে ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর হাতে শতাধিক উপজাতিসহ দুই হাজার বাঙালী নিহত হয়েছে। কমিশন আরো জানিয়েছে, এ সময়ের মধ্যে শান্তিবাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বোমা হামলায় আহত হয় প্রায় চার হাজার মানুষ এবং অপহৃত হয়েছে প্রায় ১২শ পার্বত্য অধিবাসী।[২৮]

ইর্গাজেন্সী ও কাউন্টার ইন্সার্জেন্সী ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সমস্ত পরিবেশ বিরাজ করে তাতে সংকিত ও ভয়ে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার উপজাতি ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছু উপজাতি আন্তর্জাতিক সীমান্তের দুর্গম এলাকায় আশ্রয় নেয়। ইন্সার্জেন্সী ও কাউন্টার ইন্সার্জেন্সীর ফলে সৃষ্ট এই মানবিক ট্র্যাজেডি অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৮৬ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সংকলিত হয়। 'Bangladesh : Unlawful Killing & Torture In the Chittaging Hill Tracts, London, 1986." বিশেষকরে ইহাতে দেখানো হয় যে, কাউন্টার ইন্সার্জেন্সীর ফলে সৃষ্ট অবস্থা এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন অপরাধের বর্ণনা। ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে দাতা গোষ্ঠীসহ পশ্চিমা বিশ্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে যে উক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের। যার ফলশ্রুতিতে শুরু হয় সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে আলোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঃ একটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ঃ একটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা

❑ ভূমিকা ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত উপজাতীয়রা তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য এবং "জুম্ম জাতীয়তাবাদ" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশী সময় ধরে যে সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রাম করে আসছে তারই সফল বাস্তবায়ন শান্তি চুক্তি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারের উপর উপজাতীয় নেতৃত্বের আস্থাহীনতার কারণে সৃষ্ট ইন্সার্জেন্সী এবং তার বিপরীত কাউন্টার ইন্সার্জেন্সীর ফলে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম অশান্ত হয়ে উঠে। এই অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির কপোত উড়াতে প্রত্যেক সরকার তার সাধ্যমত চেষ্টা করে এসেছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় জিয়াউর রহমান সরকার, এরশাদ সরকার এবং খালেদা জিয়া সরকার উপজাতীয় নেতৃত্বের সাথে তথা জনসংহতি সমিতির সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে আলোচনায় বসেছেন। লক্ষ্য একটি- শান্তি। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন নির্বাচনে বিজয়ী শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী সরকার সমূহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনায় বসেন। শেখ হাসিনা সরকারের গঠিত জাতীয় কমিটির সাথে জনসংহতি

Dhaka University Institutional Repository

সমিতির সাত দফা বৈঠকের সফল সমাপ্তি ঘটে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং। বর্তমান অধ্যায়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার সমূহ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য নেতৃবৃন্দের সাথে যে সকল আলোচনা, সমঝোতা ও চুক্তি হয়েছে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি পর্যন্ত একটি দীর্ঘ পথ পরিক্রমা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১ ১৯৭১ থেকে ১৯৯৭ ঃ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যে দৃষ্টি ভঙ্গি পোষণ করেছেন তাকে উপজাতি সমাজ সুন্দরভাবে মেনে না নিয়ে বরং ইন্সার্জেন্সী তৎপরতা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিতে তৎকালীন সরকার তথা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাটিকে গভীরভাবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের চেষ্টা করেন। তৎসময়ে সহিংস তৎপরতা দমনে জিয়া সরকার সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি একটি মধ্যপন্থী উপজাতীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে "ট্রাইবাল কনভেনশন" গঠন করেন। শান্তি বাহিনীকে সহিংস পথ থেকে আলোচনার পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়া হয় এই ট্রাইবাল কনভেনশনকে। পাশাপাশি জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ১ জানুয়ারি অধ্যাদেশ নং ৭৭ বলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করেন। যার লক্ষ্য পাহাড়িদের (উপজাতি) মনে আস্থা ফিরে আনা। এছাড়াও ১৯৭৭ সালে গঠন করা হয় "উপজাতীয় সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

ইন্সটিটিউট।" উপজাতীয় ইন্সার্জেন্সী বন্ধ করা এবং তাদের সাথে সংলাপের পথ উন্মুক্ত করার জন্য প্রথমে চাকমা রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে উপদেষ্টা হিসাবে বিনীতা রায় পার্বত্য অসন্তোষ দমনে কোন ভূমিকা রাখতে পারেননি। পরবর্তীতে বোমাং রাজ পরিবারের সদস্য অং শৈ প্রু চৌধুরীকে উপদেষ্টা ও সুবিমল দেওয়ানকে সহকারী উপদেষ্টা নিয়োগ করেও পার্বত্য পরিস্থিতির স্থায়ী কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাননি। ১৯৮০ সালের ১৮মে রাঙ্গামাটিতে প্রেসিডেন্ট জিয়ার সঙ্গে ট্রাইবাল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্বশাসন এবং পার্বত্য এলাকায় অ-উপজাতীয়দের পুনর্বাসন বন্ধের দাবী জানালে বৈঠকটি ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ট্রাইব্যুনাল কনভেনশন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও ১৯৮৩ সালে তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ট্রাইবাল কনভেশন পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নেন। এই লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর তিন পার্বত্য জেলা সফর করেন এবং ১৯৮৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পার্বত্য এলাকার সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে ৯ অক্টোবর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির সাথে ট্রাইবেল কনভেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৯] এভাবে ক্রমান্বয়ে ট্রাইবাল কনভেশনের নেতৃবৃন্দের সাথে সরকার পক্ষের ক্রমান্বয়ে বৈঠক হতে থাকে। বলা যায় শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সকল বৈঠক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট এরশাদ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার কারনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রতি অধিক সময় ও মনোযোগ দুইই দিতে সক্ষম হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতার আলোকে চিন্তাভাবনা করে তৎকালীন সরকার (এরশাদ সরকার) বহুমুখী এবং ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রথমবারের মত এলাকাটিকে মিডিয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া। এ পদক্ষেপের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর লোকজন ভ্রমণ ও যাতায়াত শুরু করে। তদুপরি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, ছাত্র এবং অন্যান্য পেশার লোকদের জন্য পরিচিতি মূলক সফরের আয়োজন করা হয়। তবে একথাও সত্য যে সামরিক বাহিনীর সৌজন্যে পরিচালিত এ সকল ভ্রমণের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা ছিল। যার ফলে ভ্রমণকারী নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে দেখা কিংবা নিজের ইচ্ছা মতো লোকজনদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না পেলেও সচেতন শ্রেণীর এ সকল লোকজন পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি সরাসরি প্রত্যক্ষ করার একটি সুযোগ পেতে থাকেন। যা তৎকালীন সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে এবং উপজাতীয়দের ভাগ্যোন্নয়নে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করে।

এরশাদ সরকার ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা (Sepcial Economic Area) হিসেবে ঘোষণা করে। এ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো ঃ

১) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কর মওকুফ;

২) ক্যাপিটাল মেশিনারেজ এবং যন্ত্রাংশের আমদানী ফি

Dhaka University Institutional Repository

থেকে অব্যাহতি;

৩) প্রকল্পের বেলায় মাত্র ৫ শতাংশ সুদ এর বিধান প্রবর্তন যা প্রকল্প চালু হওয়ার পর দীর্ঘ মেয়াদে যছরে দশ কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য;

৪) বিদ্যুৎ/গ্যাস রেট হ্রাসকরণ;

৫) ব্যাংক ঋণের সুদ ৫ শতাংশ হ্রাসকরণ;

৬) পাহাড়ী ও বাঙালীদের যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণ;

৭) বায় বৎসরের জন্য ট্যাক্স হলিডে; এবং

৮) সকল প্রদর্শনী কেন্দ্রের (শো-হাউজ) বেলায় এক্সসাইজ ও প্রমোদ কর রেহাই প্রদান।

শুধু তাই নয়, কর্মসংস্থান, উচ্চ শিক্ষা এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে এরশাদ সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন-

১) সকল সরকারী চাকুরীতে পাহাড়ীদের জন্য ৫% কোটা সংরক্ষিত রাখা হয়।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামের বেকার পাহাড়ী যুবক/যুবতীদের দ্রুত পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার প্রথম পর্যায়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(এডি-২)-২৯/৮৭-০৯(১৯), তাং- ০৪/০১/৮৮ইং এর মাধ্যমে ৬০০টি পদ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একই মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(এডি-২)-২৯/৮৭-৭০; তাং- ০৬/০২/৮৮ইং এর মাধ্যমে ১২৭৭টি পদসহ দুপর্যায়ে মোট ১৮৭৭টি পদ সমাক্ত করে পাহাড়ী প্রার্থীদের মধ্য হতে নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা উপরোক্ত ৫% কোটার বাইরে বিশেষ বরাদ্দ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৩) এছাড়াও ১৯৮৪-৮৫ সালে ৪৫০/৫০০ জন পাহাড়ী বেকার যুবক/যুবতীকে চাকুরীর মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৪) যে সকল ক্ষেত্রে শারীরিক কঠোর পরিশ্রম করতে হয় সে সকল ক্ষেত্রে নিয়োগের বেলায় সরকার উপজাতীয়দের জন্য বয়সসীমা ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত শিথিল করেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে বয়স ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছে।

৫) শিক্ষকতা ও কারিগরি পেশা ব্যতীত সকল প্রকার চাকুরীর ক্ষেত্রে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা একধাপ নিম্নে নির্ধারণ করেছেন অর্থাৎ স্নাতক ডিগ্রীর ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাস ইত্যাদি।

৬) উপজাতীয় প্রার্থীদের বাছাইয়ের জন্য পৃথক দুইটি নির্বাচনী বোর্ডও গঠন করা হয়। ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণীর প্রদ ও এই বোর্ডের অধীনে রাখা হয়েছে।

৭) এছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে সময় সময় যে সববিধি নিষেধ আরোপ করা হয়, উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে যে সব বিধি-নিষেধ কার্যকর না করার বিধান করা হয়।

৮) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের জন্য নিম্নরূপ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (১২টি); প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয় (৬টি); কারিগরি বিদ্যালয় (৩০টি); কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি কলেজ (৬টি); রাঙামাটি প্যারা-মেডিক্যাল স্কুল (২০টি); ক্যাডেট কলেজ (৬টি)। সর্বমোট ৮০টি আসন। উচ্চ

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ৪৫% হতে ৬৫% নম্বরের প্রয়োজন হলেও পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাত্র ৪০% নম্বরের বিধান রাখা হয়।

উপজাতীয়দের জীবন ধারার উন্নয়নের পাশাপাশি উক্ত এলাকায় ইন্সার্জেন্সী এবং কাউন্টার ইন্সার্জেন্সী বন্ধের লক্ষ্যে উক্ত এলাকার সমস্যার রাজনৈতিক সমস্যা বলে উল্লেখ করেন এবং তারই পথ ধরে এরশাদ সরকার রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই উদ্যোগের অংশ হচ্ছে ১৯৮২ সালে জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা জন্য উপেন্দ্র লাল চাকমার নেতৃত্বে একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন। অবশ্য তা ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয় যখন ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মাকে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে ১৯৮৫ সালের ২৯শে এপ্রিল শান্তিবাহিনীর প্রীতি গ্রুপ সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করলে পার্বত্য রাজনীতির ধারায় কিছুটা ভিন্নমুখী রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯৮৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের সাথে তথা এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় কমিটি জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় দফা বৈঠকে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম তাদের ৫ দফা দাবীনামা আনুষ্ঠানিকভাবে উথাপন করা হয়। এবং জনসংহতি সমিতির ৫ দফার প্রেক্ষিতে এরশাদ সরকার ৯ দফা প্রস্তাব পেশ করে। নিম্নে প্রস্তাবগুলো তুলে ধরা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫-দফা দাবিনামা

১৯৮৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির দ্বিতীয় দফা বৈঠকে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম তাদের ৫-দফা দাবিনামা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করা হয়। নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে তার বিবরণ ঃ

১. ক. পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা।

খ. নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।

গ. প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে এবং প্রদেশ তালিকাভূক্ত বিষয়ে এই প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অধিকারী হবে।

ঘ. দেশরক্ষা, বৈদেশিক মুদ্রা ও ভারী শিল্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বনজ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মৎস, অর্থ, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, বেতার ও টেলিভিশন, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহন, ডাক, কর ও খাজনা, জমি ক্রয়-বিক্রয় ও বন্দোবস্তি, আইন-শৃঙ্খলা, বিচার, খনিজ তেল ও গ্যাস, সংস্কৃতি, পর্যটন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, সমবায়, সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রেস, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সীমান্ত রক্ষা, সামাজিক প্রথা ও অভ্যাস, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে প্রত্যক্ষ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও প্রদেশ যাতে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সে জন্য কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতা স্বতন্ত্রভাবে তালিকাভুক্ত করা।

চ. পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'জুম্ম ল্যান্ড' (Jumma Land) নামে পরিচিত করা।

ছ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন (Amendment) করা।

২. ক. গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যাতে না হয়, সেরকম শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

খ. বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে কেউ যেন পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন, ভূমি ক্রয় বা বন্দোবস্তি নিতে না পারে সে রকম শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নয় এরকম কোনো ব্যক্তি যাতে বিনা অনুমতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

ঘ. আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের অপরাপর অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদগ্রস্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরি আইন অথবা সামরিক আইন জারি করা না হয়, সেরকম শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. প্রাদেশিক সরকারের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নন, এমন কোনো ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাকে প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশ ব্যতীত অন্যত্র যেন বদলী না করা হয়, সেই রকম শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়ন করা।

৩. ক. (১) ১৭ আগস্ট, ১৯৪৭ সালের পর থেকে যারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে পাহাড় বা সমতল ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তী বা 'বেদখল' করেছে অথবা বসতি স্থাপন করেছে সে সকল 'বেআইনী' বহিরাগতদের' পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়া।

ক. (২) এ দাবীনামা উত্থাপনের পর বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত যেসব 'বেআইনী অনুপ্রবেশকারী' পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি ক্রয়, বন্দোবস্তী বা বেদখল করে বসতি স্থাপন করবে তাদেরকে সরিয়ে দিতে হবে।

খ. পাকিস্তান শাসনামলের শুরু থেকে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যেসব অধিবাসী ভারত ও বার্মায় চলে যেতে 'বাধ্য হয়েছে' তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ. কাপ্তাই বাঁধের জলসীমা সর্বোচ্চ সাট ফুট নির্ধারিত করা এবং এ বাঁধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসিত করা।

ঘ. (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমতিরি কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রাকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে অথবা কারও অনুপস্থিতিতে কোনো বিচার নিস্পন্ন হয়ে থাকে, তাহলে বিনাশর্তে সেসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপে জড়িত করে বা মিথ্যা অজুহাতে জুম্ম জনগণের মধ্যে যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো প্রকার মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া থাকে অথবা কারো অনুপস্থিতিতে কোন বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে বিনাশর্তে সেসব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া প্রত্যাহার ও বিচারের রায় বাতিল করা এবং কারো বিরুদ্ধে কোনো প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৪. ক. পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উন্নতিকল্পে কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, ধর্ম, ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন, যাতায়াত ও যোগাযোগ, মৎস্য,

Dhaka University Institutional Repository

বন, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেজন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

গ. বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদান করা।

ঘ. (১) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য —

ক. সাজাপ্রাপ্ত অথবা বিচারাধীন অথবা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হাতে আটককৃত সকল জুম্ম নর-নারীকে বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের উপর সকল প্রকারের নির্যাতন, নিপীড়ন বন্ধ করা।

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে যুক্তগ্রাম ও আদর্শ গ্রামের নামে গ্রুপিং করার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং যুক্তগ্রাম ও আদর্শ গ্রামসমূহ ভেঙে দেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. (১) বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হতে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'বেআইনী' অনুপ্রবেশ, পাহাড় ও সমতল ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্তী ও যেদখল এবং বসতি স্থাপন বন্ধ রাখা।

(২) দীঘিনালা, রুমা ও আলিকদম সেনানিবাসসহ বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর সকল ক্যাম্প পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তুলে নেওয়া।

☆ জনসংহতি সমিতির ৫-দফার প্রেক্ষিতে এরশাদ সরকারের ৯-দফা প্রস্তাব ঃ

১৯৮৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ বৈঠকে সরকার-পক্ষ তাদের ৯-দফার রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. সংবিধানের ২৮ ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাকে বিশেষ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করণ।

২. সংবিধানের ৯ ও ২৮ ধারার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৃথক পৃথক জেলা পরিষদ গঠন।

৩. বিষয়ভিত্তিক (Division of Subjects) স্থিরকরণ।

৪. সংবিধানের ৬৫ ধারার আলোকে জেলা পরিষদসমূহকে মূল আইনের অধীন নির্দিষ্ট বিষয়ে উপ-আইন, আদেশ, বিধি, প্রবিধান ইত্যাদি প্রণয়ন, জারী এবং কার্যকরী করার ক্ষমতা অর্পণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন জেলা পরিষদ কর্তৃক নিজস্ব এলাকার জন্য আপত্তিকর বিবেচিত হলে সংসদে পুনর্বিবেচনার দাবী সরকারকে অবগতির জন্য আইন ক্ষমতা অর্পণ।

৬. জেলা ও উপজাতীয় সার্কেলের এলাকা একত্রীকরণার্থে সীমানা পুনঃনির্ধারণ।

৭. জেলা প্রধান এবং উপজাতীয় প্রধানের (Circle Chief) সংবলিত অবস্থান নির্ণয়ন।

৮. প্রতি সার্কেলে পুলিশ বাহিনী গঠন।

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম ম্যানুয়েলের যথাযথ সংশোধন, বাস্তবায়ন অথবা বাতিলকরণ।

১৯৯২ সালের ৪ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতি যোগাযোগ কমিটির মাধ্যমে তাদের সংশোধিত ৫ দফা দাবিনামা সরকারের কাছে পেশ করে। নিম্নে তার হুবহু পাঠ তুলে ধরা হলো ঃ

জুম্ম জনগণের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রদত্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংশোধিত পাঁচ দফা দাবিনামা ঃ

চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক — ভিন্ন ভাষাভাষী এই দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম। যুগ যুগ ধরিয়া এই দশটি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, ধর্ম ও ভাষা লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করিয়া আসিতেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের প্রতিটি জাতি বড় হউক বা ক্ষুদ্র হউক সব সময়ই নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে স্বীয় জাতীয় সংহতি ও জাতীয় পরিচিতি অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা চালাইয়া আসিতেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের দশটি ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম পাহাড়ী জনগণও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

ভারতের ব্রিটিশ সরকর এই মর্মকথা অনুধাবর্পন করিতে সক্ষম হওয়ায় ১৯০০ সালের ৬ই জানুয়ারি ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি প্রণয়ন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। ইহার পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে উক্ত শাসনবিধিকে পুনরায় স্বীকৃত প্রদান করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক শাসিত অঞ্চল রূপে ঘোষণা করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা পাকিস্তান সরকারের হস্তে অর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। পাকিস্তান সরকার সংশোধিত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসনের স্বীকৃতিও প্রদান করে। পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র ১৯৫৬ সালেল ২৯শে ফেব্রুয়ারী গৃহীত হয় এবং এই শাসনতন্ত্রেও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলরূপে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। এই দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে ভারত শাসন ও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে ব্যবহৃত "পৃথক শাসিত অঞ্চল" শব্দের পরিবর্তে "উপজাতীয় অঞ্চল" শব্দ ব্যবহার করিয়া ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয় অঞ্চলের মর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বস্তুত ব্রিটিশ সরকার

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক প্রদত্ত এই শাসনবিধি উপনিবেশিক, সামন্ততান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ। এই শাসন বিধিতে জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। এই কারণে ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবী উথাপন করা হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই স্বাধীনতা যেন সকলের নিকট অর্থপূর্ণ হইতে পারে তজ্জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও দেশ ও জাতির পুনর্গঠনের মহান কর্মকান্ডে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করিয়া বাংলাদেশের উপযুক্ত নাগরিক হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চহিয়াছিল। তদুদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত স্বায়ত্তশাসনের আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণেরর সকল প্রকারের আবেদন ও বাসনা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অহঞ্চলের সত্তা চিরতরে লুপ্ত করিয়া দিয়া ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে। ফলতঃ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির স্বত্ব সংরক্ষণের যতটুকু আইনগত অধিকার ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিতে ছিল তাহাও ক্ষুন্ন হইয়া যায়।

বৃটিশ শাসনামল হইতে আজ অবধি জুম্ম জনগণ সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত হইয়া আসিতেছে। ফলশ্রুতিতে ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির জাতীয় অস্তিত্ব আজ চির বিলুপ্তির পথে। ইহা

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক ও মানসিক গঠন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রভৃতির ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ ও বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে অনেক মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় জুম্ম জনগণও বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের জনগণের ন্যায় দেশমাতৃকার সেবা করিতে দৃঢ় সংকল্প কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের ষড়যন্ত্রের ফলে ঐতিহাসিকভাবে আজ তাহারা সেই মহান দায়িত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার ক্ষেত্রে সুম্ম জনগণ নীরবে সকল বঞ্চনা ও নিপীড়ন সহ্য করিয়াও অপরিসীম ত্যাগ স্বীকারে দ্বিধাবোধ করে নাই।

ব্রিটিশ প্রদত্ত ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি জুম্ম জনগণের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে পারে নাই। অনুরূপ 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' দ্বারাও জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমিসত্ত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। কারণ এই পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক, কম ক্ষমতাসম্পন্ন ও ত্রুটিপূর্ণ। বস্তুত গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতিরেকে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমিস্বত্ব ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব অর্থাঃ দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের সংহতি, সংস্কৃতি, সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস, প্রথা, ভাষা প্রভৃতি এবং ভূমিস্বত্ব অর্থাৎ পাহাড়, বন ও ভূমির স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য, সর্বোপরি, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং

Dhaka University Institutional Repository

সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতি দ্রুতগতিতে অবসান করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থে সুন্ন জনগণের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কর্তৃক ১৯৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের নিকট পেশকৃত আইন পরিষদসহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত ৫ (পাঁচ) দফা দাবী সংশোধিত আকারে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট উপস্থাপন করা গেল —

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন (Amndment) করিয়া —

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।

খ) আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council) সমন্বিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, উপআইন, আদেশ, নোটিশ প্রণয়ন, জারী ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) পরিষদের তহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রাখিয়া স্বাধীনভাবে হাতে থাকিবে।

চ) আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে — ১. পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা; ২. জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ; ৩. পুলিশ; ৪. ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৫. কৃষি, কৃষি ও উদ্যান উন্নয়ন; ৬. কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা; ৭. বন, বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৮. গণস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা; ৯. আইন ও বিচার; ১০. পশুপালন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ; ১১. ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্ত; ১২. ব্যবসা-বাণিজ্য; ১৩. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প; ১৪. রাস্তা-ঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা; ১৫. পর্যটন; ১৬. মৎস্য, সৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ; ১৭. যোগাযোগ ও পরিবহন; ১৮. ভূমি রাজস্ব, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ধার্যকরণ; ১৯. পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ; ২০. হাট-বাজার ও মেলা; ২১. সমবায়; ২২. সমাজ কল্যাণ; ১৩. অর্থ; ২৪. সংস্কৃতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান; ২৫. যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া; ২৬ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা; ২৭. মহাজনী কারবার ও ব্যবসা; ২৮. সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি; ২৯. মদ চোলাই, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবরাহ; ৩০. গোরস্থান ও শ্মশান; ৩১. দাতব্য প্রতিষ্ঠান,

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনাগার; ৩২. জল সম্পদ ও সেচ ব্যবস্থা; ৩৩. জুম চাষ ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসন; ৩৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৩৫. কারাগার; ৩৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ক) চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খুমী, খিয়াং ও চাক — এই ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা;

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি 'বিশেষ শাসনবিধি' অনুযায়ী শাসিত হইবে — সংবিধানে এই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

গ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এই রকম কোনো ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে সেইরকম আইনবিধি (Inner Line Regulation) প্রণয়ন করা। তবে শর্ত থাকে যে কর্তব্যরত সরকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

ঙ) ১. গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাইয়ের ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় লইয়া কোনো শাসনতান্ত্রিক সংশোধন (Amendment) যেন না করা হয় সংবিধানে সেইরকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

২. আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোনো আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

চ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের লইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা। তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন করা;

ছ) যুদ্ধ বা বহিঃআক্রমণ ব্যতীত আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বা উহার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হইলেও আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা;

জ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বয়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোনো ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করা না হয় সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা। তবে কোনো পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে উক্ত পদে নিয়োগ করা।

২.১. ক) রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান — এই তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রি পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'জুম্মল্যান্ড' (Jumma Land) নামে পরিচিত করা।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জন্য একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসনসমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।

৫. ক) কাপ্তাই বিদ্যুত প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা (Power Project Center Area) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারাখানা এলাকা এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে

Dhaka University Institutional Repository

অধিগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

খ) কাপ্তাই জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা (Power Project Center Area) যেতমুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিগ্রহণকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা।

গ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তির দ্বারা বেদখলকৃত ও অন্য কোন উপায়ে বন্দোবস্ত কৃত বা ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত সমস্ত জমি ও পাহাড়ের প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট বা কোন সংস্থাকে যে সমস্ত জমি বা পাহাড় রাবার চাষ, বনায়ন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে 'লীজ' (Lease) বা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত জমির লীজ ও বন্দোবস্ত বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমিও পাহাড় পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

Dhaka University Institutional Repository

চ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত সকল এলাকা পরষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন করা।

৩. ১) ১৮৭ আগস্ট, ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করিতেছে সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

২) ১৯৬০ সালের পর হইতে যে সকল জুম্ম নর-নারী ভারতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের সকলের সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩) কাপ্তাই বাঁধের সর্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৪. ক) সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া ।

খ) বহিঃশত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধাবস্থায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সেনাবাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনানিবাস স্থাপন না করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১. ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া থাকে অথবা কাহারো অনুপস্থিতিতে যদি কোন বিচার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বিনা শর্তে সেই সব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও উক্ত বিচারের রায় বাতিল করা এবং কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপে জড়িত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট থাকে তাহা হইলে বিনা শর্তে সেইসব মামলা, অভিযোগ ও কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

403552

২. ক) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণের জন্য নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা লাভের সুযোগ প্রদান করা।

গ) সরকারী চাকুরীতে জুম্ম জনগণের জন্য বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৩. ক) সরকারী অনুদানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

খ) ভূমিহীন ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসনসহ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তজ্জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বহাল রাখা এবং উহা পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়িয়া তোলা একান্ত অপরিহার্য। তৎপরিপ্রেক্ষিত —

১. সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে আটককৃত সকল জুম্ম নর-নারীকে বিনা শর্তে অনতিবিলম্বে মুক্তি প্রদান করা।

২. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকীকরণ করা।

৩. জুম্ম জনগণকে গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম, যুক্তগ্রাম ও আদর্শগ্রামের নামে গ্রুপিং করিবার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং এই গ্রামসমূহ অনতিবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল হইতে আসিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বহিরাগতদেরকে পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অনতিবিলম্বে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

৬. সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (BDR) ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্পসমূহ পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া।

তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী এ. কে. খন্দকারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি শান্তি বাহিনীর সাথে কোন প্রকার ঐক্যমতে পৌঁছতে না পেরে পার্বত্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে একটি কাঠামো দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। এই কাঠামোর ভিত্তিতে সরকার এবং তিন পার্বত্য জেলার গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনটি পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত তিনটি চুক্তির ভিত্তিতে পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে জাতীয় সংসদে তিন পার্বত্য জেলার জন্য তিনটি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ বিল পাস হয়। যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। এখন নিম্নে রাঙ্গামাটি (পৃথকভাবে প্রণীত একই আইন বিধায় 'রাঙ্গামাটির' স্থলে 'খাগড়াছড়ি' বা 'বান্দরবান' পাঠ করতে হবে) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ উপস্থাপন করা হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ :

বাংলাদেশ গেজেট

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫/৬ই মার্চ, ১৯৮৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ৬ই মার্চ, ১৯৮৯ (২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ

১৯৮৯ সনের ১৯নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন যেহেতু রাংগামাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা বিধায় উহার সর্বাংগীন উন্নয়নকল্পে উহার জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়ঃ

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরণামা ও প্রবর্তন। — (১) এই আইন রাংগামাটি পাবর্ত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। সংজ্ঞা। — বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে —

ক) "অ-উপজাতীয়" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন;

খ) "উপজাতীয়" অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মায়মা, তনচৈংগা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু ও খেয়াং উপজাতীয় সদস্য;

গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

ঘ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

ঙ) "পরিষদ"অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ;

চ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

ছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

জ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;

ঝ) "সদস্য" অর্থ পরিষদের সদস্য।

৩। রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপন। —

(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, রাংগামাটি পাবর্ত্য জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। পরিষদের গঠন। —

(১) নিম্নরূপ সদস্য- সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথাঃ —

ক) চেয়ারম্যান;

খ) বিশ জন উপজাতীয় সদস্য;

গ) দশ জন অ-উপজাতীয় সদস্য।

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(৩) উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে —

ক) দশ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে;

খ) চার জন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে;

গ) দুই জন নির্বাচিত হইবেন তনচৈংগা উপজাতি হইতে;

ঘ) এক জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে;

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) এক জন নির্বাচিত হইবেন লুসাই উপজাতি হইতে;

চ) এক জন নির্বাচিত হইবেন পাংখু উপজাতি হইতে;

ছ) এক জন নির্বাচিত হইবেন খেয়াং উপজাতি হইতে।

(৪) চেয়ারম্যান উপজাতীয়গনের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা জেলার ডেপুটি কমিশনার স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা। —

১) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

২) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৬। উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।—

(১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে কোন উপজাতির অন্তর্ভূক্ত হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩)- এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি তাঁহার উপজাতির জন্য নির্ধারিত আসনে উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, অ-উপজাতীয় হইলে এবং তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-উপজাতীয়দের জন্য নির্ধারিত আসনে অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উাপজাতীয় বা অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি —

ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

খ) তাহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

গ) তিনি দেওলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায়

Dhaka University Institutional Repository

হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাংগামাটি পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;

ঙ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থায়ী কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়াম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;

জ) তিনি পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের দোকানদার হন অথবা

ঝ) তাঁহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রুপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্পঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ। — চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথ পত্র বা ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন, যথাঃ —

"আমি ..... , পিতা বা স্বামী ..... রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব।"

৮। **সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা।** — চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহনের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা। — "পরিবারের সদস্য" বলতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার সংগে বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাহার ছেলেমেয়ে, পিতা-মাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

৯। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা।** — চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১০। **পরিষদের মেয়াদ**। — পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে তিন বৎসরঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নূতন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১১। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ**। — ১)সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্র যোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্বীয়পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১২। **চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ**। — চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি —

ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

খ) তাহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারনে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহ আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা। — এই উপ-ধারায় "অসদাচরণ" বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১)-এ বর্নিত কোন কারনে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহূত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে তাহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহনের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দান করিতে হইবে।

৩) উপ-ধারা(২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া। — (১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি —

Dhaka University Institutional Repository

ক) তাহার নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৭-এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন;

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরুপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারনে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;

খ) তিনি ধারা ৫ বা ৬-এর অধীনে তাহার পদে থাকার অযোগ্য হইয় যান;

গ) তিনি ধারা ১১-এর অধীনে তাহার পদ ত্যাগ করেন;

ঘ) তিনি ধারা ১২-এর অধীনে তাহার পদ হইতে অপসারিত হন;

ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার নির্বাচনের পর ধারা ৫বা ৬-এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কি না সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে, নিস্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের সচিব কর্তৃক রাংগামাটি পার্বত্য জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে, এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরুপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। **অস্থায়ী চেয়ারম্যান।** — চেয়ারম্যানের পদ কোন কারনে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারনে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে সমথ্য হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৫। **আকস্মিক পদ শূন্যতা।** — পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার ষাট দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৬। **পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়।** — (১)

পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ষাট দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

২) পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্বে পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৭। **ভোটার তালিকা।**— জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ রাগামাটি পার্বত্য জেলাভূক্ত এলাকা সংক্রান্ত, ভোটার

Dhaka University Institutional Repository

তালিকায় সেই অংশ পরিষদের যে কোন নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে।

১৮। **ভোটাধিকার।** — কোন ব্যক্তির নাম, ধারা ১৭-তে উল্লিখিত ভোটার তালিকায় আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকিলে তিনি পরিষদের যে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন।

১৯। **দুই পদের জন্য একই সংগে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ।** — কোন ব্যক্তি একই সংগে চেয়ারম্যান এবং উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। **নির্বাচন পরিচালনা।**— (১) সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন, অতঃপর নির্বাচন কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনা করিবে।

(২) সরকার, সারকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যন ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ-

ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্ণিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাঁহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;

Dhaka University Institutional Repository

গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;

ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার;

ঙ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;

চ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

ছ) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

জ) ভোট দানের পদ্ধতি;

ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবন্টন;

ঞ) নির্বাচনী ব্যায়;

ঠ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দন্ড;

ড) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং

ঢ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুসংগিক অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা (২) (ঠ)-এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদন্ডের মেয়াদ দুই বৎসরের অধিক এবং অর্থদন্ডের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২১। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ।** — চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। **পরিষদের কার্যাবলী।**— প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হইবে, এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

২৩। **সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি।**— এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে —

(ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে;

হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪। **নির্বাহী ক্ষমতা।** — (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।

(২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে।

২৫। **কার্যাবলী নিষ্পন্ন**। — (১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটি সমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) পরিষদের কোন সদস্য শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। **চাকমা চীফের পরিষদের সভায় যোগদানের অধিকার।** — রাঙ্গামাটি চাকমা চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২৭। **কমিটি।** — পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৮। **চুক্তি।** — (১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি —

ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে।

খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণে করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। **নির্মাণ কাজ।** — পরিষদ প্রবিধান দ্বারা —

(ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করার বিধান করিবে;

(খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে ইহার বিধান করিবে;

(গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হইবে উহার বিধান করিবে।

৩০। **নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি।** — পরিষদ —

(ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(খ) প্রতিধানে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারেব।

৩১। **পরিষদের সচিব।** — (১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকারবলে পরিষদের সচিব হইবেন।

(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে পরিষদের সভা আহ্বান, সভা পরিচালনা ও সভার কার্যসূচী নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩২। **পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।** — (১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

৩৩। **ভবিষ্যৎ তহবিল ইত্যাদি।** — (১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্যৎ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কার্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) পরিষদ ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে গ্রাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদান্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত গ্র্যাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫)-এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। **চাকুরী প্রবিধান**। — পরিষদ প্রবিধান দ্বারা —

ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

Dhaka University Institutional Repository

গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে;

ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩৫। **পরিষদের তহবিল গঠন।** — (১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ-

(ক) জিলা পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ;

(খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পরিষদের উপর ন্যাস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;

(জ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। **পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি।** — (১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে রাখা হইবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলে কিছু অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৭। **পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ।** — (১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা ঃ-

প্রথমত ঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

দ্বিতীয়ত ঃ এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

তৃতীয়ত ঃ এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

চতুর্থত ঃ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমত ঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় ।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীর দেয় অর্থ;

(খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব-নিরীক্ষণ বা অন্য কোন বিসয়ের জন্য দেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায় , ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয় ।

(৩) পরিষদের তহবিলের দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে, যতদূর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে ।

৩৮ । **বাজেট** । — (১) প্রতি অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং

Dhaka University Institutional Repository

উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কোন অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার আদেশ দ্বারা, বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথম যার যে অর্থ-বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহনের পর অর্থ-বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। **হিসাব**। — (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাইবে।

(২) প্রতিটি অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ-বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদ বিবেচনা করিবে।

৪০। **হিসাব নিরীক্ষা**। — (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

(২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা : —

Dhaka University Institutional Repository

(ক) অর্থ আত্মসাৎ;

(খ) পরিষদ তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;

(গ) হিসাব রক্ষণে অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৪১। **পরিষদের সম্পত্তি**। — (১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা —

(ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে;

(২) পরিষদ —

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করিতে পারিবে;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;

(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪২। **উন্নয়ন পরিকল্পনা।** — (১) পরিষদ উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলে সংগতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে, যথা : —

(ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হইবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হইবে;

(খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে;

(গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

(৩) পরিষদ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৩। **পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়।** — পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে উহার জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাঁহার এই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাঁহাকে দায়ী করা

Dhaka University Institutional Repository

হইবে সেই টাকা সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪৪। **পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর ইত্যাদি।** — পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে।

৪৫। **কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি।** — (১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্দ্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে, এবং সরকার ভিন্নরূপে নির্দেশ না দিলে, উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

৪৬। **কর সংক্রান্ত দায়।** — কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কি না উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে পরিষদ, নোটিশের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র, হিসাববহি বা জিনিষপত্র হাজির করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। **কর আদায়।** — (১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা, নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় করা হইবে।

(২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৮। **কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি।** — প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় এই আইনের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদসংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির উহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৯। **কর প্রবিধান।** — (১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস এবং অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

(২) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, করদাতাদের করণীয় এবং কার্য ধার্যকারী আদায়কারী কর্মকর্তা, অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫০। **পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান।** — এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

৫১। **পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।** — (১) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার আদেশ দ্বারা —

(ক) পরিষদের কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে;

(গ) প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদকে আদেশে উল্লিখিত কোন কাজ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীনে কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে পরিষদ আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রতিবাদ করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত প্রতিবাদ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার উক্ত আদেশটি হয় বহাল রাখিবে নতুবা সংশোধন অথবা বাতিল করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) যদি কোন কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত আদেশটি বহাল অথবা সংশোধন করা না হয় তাহা হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। **পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত।** — (১) সরকার, স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা তৎসংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্যও নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণের জন্য Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908)-এর অধীন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৫৩। **পরিষদ বাতিলকরণ।** — (১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে পরিষদ —

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

(ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;

তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, পরিষদকে, উহার মেয়াদের অবশিষ্ট কার্যকালের অনধিক কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে —

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

৫৪। **যুক্ত কমিটি**। — পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিকে উহার যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫। **পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ।** — পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এ ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। **অপরাধ।** — তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৫৭। **দণ্ড।** — এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক পঁচিশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৫৮। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।** — চেয়ারম্যান বা পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৫৯। **অভিযোগ প্রত্যাহার।** — চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৬০। **অবৈধভাবে পদার্পণ।** — (১) জনপথ ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে পদার্পণ করিবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উক্তরূপ অবৈধ পদার্পণ হইলে পরিষদ নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধভাবে পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাঁহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে পরিষদ অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবৈধ পদার্পণকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেইজন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

(৩) অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর উপর এই আইনের অধীন ধার্য কর বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। **আপীল**। — এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬২। **জেলা পুলিশ**। — (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তন্নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যের চাকুরীর শর্তাবলী, তাঁহাদের প্রশিক্ষণ, সাজসজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাঁহাদের পরিচালনা অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন, উপ-ধারা (১)-এর বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে, আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৬৩। **পুলিশের দায়িত্ব।** — রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উহার তথ্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইহার কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬৪। **ভূমি হস্তান্তরে বাধানিষেধ।** — আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গাজমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত (Protected) ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা-জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা-জমি বা মালের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৬৫। **ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।** — আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেলায় ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলায় আদায়কৃত উক্ত করের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিষদের তহবিলে অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

৬৬। **উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।** — (১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা এমন উপজাতীয়গণের মধ্যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির

Dhaka University Institutional Repository

জন্য স্থানীয় কারবারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতীয়গণের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) কারবারী বা ডেহম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাংগামাটি চাকমা চীফের নিকট আপীল করা যাইবে।

(৩) চাকমা চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতি হইতে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন তিন জন উপজাতীয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই ধারায় উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য —

(ক) বিচার পদ্ধতি,

(খ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ। — সরকার প্রয়োজন হইলে, আদেশ দ্বারা পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয়ের বিধান করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬৮। **বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা।** — (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতা সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;

(গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;

(ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;

(ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;

(চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

৬৯। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।** — (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বা কোন বিধিবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা যে কোন বিষেয়ে বিধান করা যাইবে, যথা ঃ-

(ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা,

(খ) পরিষদের সভায় ফোরাম নির্ধারণ,

(গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উথাপন,

(ঘ) পরিষদের সভা আহ্বান,

(ঙ) পরিষদের সবার কার্যবিবরণী লিখন,

(চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন,

(ছ) সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার,

(জ) পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ,

(ঝ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ,

(ঞ) কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়,

(ট) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃঙ্খলা,

(ঠ) কর, রেইট, টোল এবং ফিস ধার্য ও আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়,

(ড) পরিষদের সম্পত্তিতে অবৈধ পদার্পণ নিয়ন্ত্রণ,

Dhaka University Institutional Repository

(ঢ) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় রেজিস্ট্রীকরণ,

(ণ) এতিমখানা, বিধবা সদন এবং দরিদ্রদের ত্রাণ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ,

(ত) জনসাধারনের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(থ) টীকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,

(দ) সংক্রামক ব্যধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ,

(ধ) খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধ,

(ন) সমাজের বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ,

(প) বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ,

(ফ) জনসাধারণের ব্যবহার্য ফেরীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(ব) গবাদি পশুর খোয়াড়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(ভ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ,

(ম) মেলা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ,

(য) বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,

(র) ভিক্ষাবৃত্তি, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ,

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ,

(শ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

(৩) পরিষদের বিবেচনায় যে প্রকারের প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

৭০। **ক্ষমতা অর্পণ**। — সরকার এই আইনের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৭১। **পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা**। — (১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ —

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পেশ করিতে হইবে,

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার অফিস বা

Dhaka University Institutional Repository

বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌঁছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৭২। **নোটিশ এবং উহা জারীকরণ।** — (১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা হইতে বিরত থাকা যদি ব্যক্তির কর্তব্য হয় তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে ইহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে, তাহা উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপর একটি নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহা প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাঁহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাঁহাদের বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন বিশিষ্ট স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারী করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারী করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩। **প্রকাশ্য রেকর্ড।** — এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিষ্ট্রার Evidence Act, 1872 (1 of 1982) তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে উহাকে বিশুদ্ধ রেকর্ড বা রেজিষ্ট্রার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৭৪। **পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (Public servant) হিসাবে গণ্য হইবেন।** — পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর Section 21- এ যে অর্থে জনসেবক (Public servent) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৫। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।** — এই আইন, বিধি বা প্রবিধান-এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।** — (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হইবার সংগে সংগে স্থানীয় সরকার (জেলা

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ) আইন ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে রহিত হইবে।

(২) উক্ত আইন উক্তরূপে রহিত হইবার পর —

(ক) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, অতঃপর উক্ত জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিধি, প্রবিধান ও বাই-ল প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল আদেশ, জারীকৃত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত, প্রদত্ত, জারীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সকল বাই-ল প্রবিধান বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধা, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয়, উহার যাবতীয় অধিকার বা উহাতে ন্যাস্ত

Dhaka University Institutional Repository

যাবতীয় স্বার্থ পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যাস্ত হইবে;

(ঘ) উক্ত জেলা পরিষদের যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প ও পরিকল্পনা যা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সমাঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, এবং পরিষদ কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(চ) উক্ত জেলা পরিষদের প্রাপ্য সকল কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই আইনের অধীন পরিষদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;

(ছ) উক্ত আইন রহিত হইবার পূর্বে উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল ও ফিস এবং অন্যান্য দাবী, পরিষদ কর্তৃক, পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, একই হারে অব্যাহত থাকিবে;

Dhaka University Institutional Repository

(জ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদে বদলী হইবেন ও উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং তাঁহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরীরত ছিলেন, পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে, সেই শর্তেই তাঁহারা উহার অধীনে চাকুরীরত থাকিবেন;

(ঝ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা-মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৭। **নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি।** — এই আইনে কোন কিছু করিবার বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কাজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

৭৮। **অসুবিধা দূরীকরণ।** — এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৯। **কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি।** — রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রথম তফসিল

পরিষদের কার্যাবলী

[ধারা ২২ দ্রষ্টব্য]

১। জেলার আইন শৃংখলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।

২। জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ, উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা —

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা;

(ঘ) ছাত্রাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;

(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান;

(ছ) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা;

(জ) শিশু ছাত্রদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ ও খাদ্যের ব্যবস্থা;

(ঝ) গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ;

(ঞ) পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। স্বাস্থ্য —

(ক) হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রথমত চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিস্‌পেনসারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল গঠন, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য সমিতি গঠনে উৎসাহ দান;

(গ) ধাত্রী প্রশিক্ষণ;

(ঘ) ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(চ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শণ;

(ছ) কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীর কার্য পরিদর্শন;

(জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কীত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রস্তাব।

৬। কৃষি ও বন —

(ক) কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বা রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

(গ) উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান;

(ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে বনভূতি সংরক্ষণ;

(চ) কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কোন ব্যাঘাত না ঘটাইয়া, বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষিকার্যে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন;

(জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন;

(ঝ) শষ্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্যে বীজের ঋণ দান, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ;

(ঞ) রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

৭। **পশু পালন** —

(ক) পশুপাখী উন্নয়ন;

(খ) পশুপাখীর হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) পশু খাদ্যের মজুদ গড়িয়া তোলা;

(ঘ) গৃহপালিত পশুসম্পদ সংরক্ষণ;

(ঙ) চারণ ভূমির ব্যবস্থা ও উন্নয়ন;

(চ) পশুপাখীর ব্যাধি প্রতিরোধ ও দূরীকরণ এবং পশুপাখীর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) দুগ্ধ পল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ;

(জ) গৃহপালিত পশু খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঝ) হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঞ) গৃহপালিম পশু ও হাঁস-মুরগী পালন উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) দুগ্ধ খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

৮। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

১০। **শিল্প ও বাণিজ্য** —

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পস্থাপন এবং উহাতে উৎসাহ দান;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) স্থানীয় ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) হাটবাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা;

(ঙ) গ্রামভিত্তিক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) গ্রাম বিপণী স্থাপন ও সংরক্ষণ।

১১। সমাজকল্যাণ —

(ক) দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, অনাথ আশ্রয়, এতিমখানা, বিধবা সদন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ;

(ঘ) জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর উন্নয়ন;

(ঙ) দরিদ্রদের জন্য আইনের সাহায্য (লিগ্যাল এইড) সংগঠন;

(চ) সালিশী ও আপোষের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) দুঃস্থ ও ছিন্নমূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;

(জ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

১২। সংস্কৃতি —

(ক) সাধারণ ও উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকান্ড সংগঠন ও উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) জনসাধারণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধূলার উন্নয়ন;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে মেডিওর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন ও প্রদর্শনীর সংগঠন;

(ঙ) পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থা;

(চ) নাগরিক শিক্ষার প্রসার, এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন, কৃষি শিক্ষা, গবাদি পশু প্রজনন সম্পর্কিত এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য প্রচার;

(ছ) জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদ্‌যাপন;

(জ) বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা;

(ঝ) শরীরচর্চার উন্নয়ন, খেলাধূলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা;

(ঞ) স্থানীয় এলাকায় ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ;

(ট) তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঠ) সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

১৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষনে নহে এমন খেয়াগাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলো এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজকরণ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রনয়ন।

২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় তফসিল

পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস

[ধারা ৪৪ দ্রষ্টব্য]

১। স্থাপন সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ।

২। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৩। পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল।

৪। পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট।

৫। পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস।

৬। পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হইতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস।

৭। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস।

৮। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় তফসিল

এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ

[ধারা ৫৬ দ্রষ্টব্য]

১। পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

২। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে পরিষদ কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।

৩। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সে কার্য বিনা লাইসেন্সে বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জনপথে অবৈধ পদার্পণ।

৫। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।

৬। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হওয়ার সন্দেহে এই আইনের অধীন কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

৭। জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা-পেশাব করানো বা গোসল করানো।

Dhaka University Institutional Repository

৮। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শণ, পাট বা অন্য কোন গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

৯। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

১০। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি খনন, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

১১। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটি, চুন-ভাটি, কাঠ-কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

১২। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ দূরত্বের মধ্যে জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

১৩। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন জমি বা ইমারত হইতে আবর্জনা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোন পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।

১৪। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুণ্ড, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে, অপসারণে, মেরামতে, পরিষ্কার করিতে, জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। এই আইনের অধীন কোন আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষণা করা সত্ত্বেও, ইহা অপসারণ বা পরিস্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

১৬। জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতামগুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুকুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা উহা এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও, সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাঁটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

১৭। এই আইনের অধীনে জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

১৮। এই আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাল বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের জন্য কোন উৎস পরিস্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা উহা হইতে পানি নিস্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২০। এই আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে কোন পানি বা আবর্জনা নিস্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২১। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

২২। কোন দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির পরিষদকে খবর দিতে ব্যর্থতা।

২৩। সংক্রামক রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত কোন দালানকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২৪। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা।

২৫। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

২৬। দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

২৭। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।

২৮। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো।

২৯। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি-মিনতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত বা গলিত অংশ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৩০। এতদুদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

৩১। কোন বৃক্ষ বা উহার শাখা কর্তৃক বা কোন দালান বা উহার কোন অংশ নির্মাণ বা ভাংচুর এই আইনের অধীন জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক বা বিরক্তিকর বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার কর্তন, নির্মাণ বা ভাংচুর।

৩২। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণ।

৩৩। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন বিজ্ঞাপন, নোটিশ, প্ল্যাকার্ড বা অন্য কোন প্রকার প্রচারপত্র আঁটিয়া দেওয়া।

৩৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তূপীকৃত করা।

৩৫। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাতে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তাবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

৩৭। সূর্যাস্তের অর্ধঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহনে যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৩৮। যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য কোন যানবাহনের ডান পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি না মানা।

৩৯। এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা ভংগ করিয়া রেডিও বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ঢাকঢোল পিটানো, ভেঁপু বাজানো, অথবা কাঁসা বা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

৪০। আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতসবাজী, এমনভাবে ছোঁড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪১। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালানকোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৪২। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা বা শব দাহ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

৪৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন দালানকে ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

৪৫। এই আইনের অধীন মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৪৬। এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন দালান চুনকাম বা মেরামত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে ব্যর্থতা।

৪৭। এই আইন বা কোন বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারীকৃত কোন বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

৪৮। এই তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।

৫.৩ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৭ ঃ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ

১৯৯০ সালের জুলাই মাসে স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ নামে একটি পৃথক বিভাগ গঠন করা হয়। এই বিভাগের প্রধান ও একমাত্র কাজ হলো- পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি দেখাশোনা, তদারকি এবং সমন্বয় সাধন প্রভৃতি। তাই এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধনের লক্ষে এই বিভাগটির দায়িত্ব ন্যস্ত করেন

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতির হাতে; যাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন কাজে কোন মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সময় অপচয় না হয় এবং জটিলতা সৃষ্টি না হয়। পরবর্তীতে খালেদা জিয়ার সাফায় ১৯৯১ সালে উক্ত 'স্পেশাল এফেয়ার্স বিভাগ'কে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্য দিয়ে এই বিভাগকে আরো শক্তিশালী করা হয়। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর এই বিভাগটিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় উপজাতীয় নেতা কল্পরঞ্জন চাকমাকে।

১৯৯১ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সশস্ত্র ইন্সার্জেন্টদের জন্য সাধারণ ক্ষমতা ঘোষণা করেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষে শান্তি বাহিনীর সাথে সংলাপ অব্যাহত রাখার জন্য উপজাতীয় নেতা হংসধ্বজ চাকমাকে আহ্বায়ক করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি লিয়াঁজো কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া ২০ অক্টোবর ১৯৯১ইং তারিখে খালেদা জিয়াকে প্রধান করে ৮ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীপরিষদ এবং ৯ জুলাই ১৯৯২ইং তারিখে তৎকালীণ যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহমদের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া রাশেদ খান মেননকে প্রধান করে তৈরি করা হয় আরেকটি উপকমিটি। খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সংসদীয় কমিটির সাথে শান্তি বাহিনীর সাতটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (১ম— ৫ নভেম্বর ১৯৯২; ২য়— ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯২; ৩য়— ২২মে ৯৩; ৪র্থ— ১৪ জুলাই ৯৩; ৫ম— ১৮ সেপ্টেম্বর ৯৩; ৬ষ্ঠ— ২৪ নভেম্বর ৯৩; ৭ম— ৫মে ৯৪)। তবে একথা সত্য যে, শান্তি বাহিনীও আলোচনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তারই বহি:প্রকাশ হিসাবে আমরা দেখি ১৯৯২ সালের ১ আগস্ট শান্তি বাহিনী একতরফা ভাবে অস্ত্র বিরতি ঘোষণা করে এবং ৩৫ দফায় ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির সময়সীমা বৃদ্ধি করে। সরকার পক্ষও আলোচনার সুবিধার্থে অস্ত্র বিরতি মেনে চলে। এছাড়া খালেদা জিয়া সরকার উপজাতি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়া শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ভারত সরকারের সাথে ১৯৯৩ সালের ৯মে একটি সমঝোতা চুক্তিতে উপনীত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সালে ৩৭৯টি পাহাড়ী শরণার্থী পরিবারের (প্রথম ব্যাচ) বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে। তবে একথা সত্য যে এই প্রত্যাবর্তন অব্যাহত থাকলেও আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।

সংসদীয় কমিটি (জাতীয় কমিটি) এবং সংসদীয় কমিটির উপকমিটি ১৩ বৈঠকের মাধ্যমে শান্তি বাহিনীর সাথে যে আলোচনা হয় তা ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির একটি পথ তৈরি করে দিয়েছিল। এই সময় শান্তি বাহিনীও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন

Dhaka University Institutional Repository

কথা উল্লেখ করে এবং সরকারও নমনীয় ও সম্মতিসূচক অবস্থান গ্রহণ করে। বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির দাবী অনুযায়ী খালেদা জিয়া সরকার পার্বত্য অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এলে প্রতিরক্ষায় অপরিহার্য সামরিক ক্যাম্প ছাড়া অস্থায়ী ক্যাম্পসমূহ পর্যায়ক্রমে তুলে নেয়ার ব্যাপারেও সম্মত হয়।[৩৩]

শুধু তাই নয় ১৯৮৯ সালে পাসকৃত পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল আইনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছা এবং চুক্তি সই করার প্রায় দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে ছিল। যা ১৯৯৭ সালে চুক্তি পরবর্তী আওয়ামী নেতাদের কণ্ঠে ধ্বনিত। এভাবে খালেদা জিয়া সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল যা সমাধানের পথে এক নতুন দিগন্তের অবতারণা করে।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন তত্ত্বাবদায়ক সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য প্রতিষ্ঠিত শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে মনোনিবেশ করেন। কারণ নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা — মর্মে ঘোষণা দেয়। ফলশ্রুতিতে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনই লাভ করে যা সরকারের জন্য সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় এগিয়ে নিতে

Dhaka University Institutional Repository

বহুলাংশে সহায়কা ভূমিকা পালন করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনসংহতি সমিতি অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে যা সরকারও গ্রহণ করে। ফলে পূর্ববর্তী সমিতির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তৎকালীন জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়।

উক্ত জাতীয় কমিটির সাথে জনসংহাতি সমিতির সাত দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। (১ম বৈঠক ২১ডি.-২৪ডি. ১৯৯৬; ২য় বৈঠক ২৫জানু-২৭জানু ১৯৯৭; ৩য় বৈঠক ১২মার্চ-১৩মার্চ ১৯৯৭; ৪র্থ বৈঠক ১১মে-১৪মে ১৯৯৭; ৫ম বৈঠক ১৪ জুলাই-১৮ জুলাই ১৯৯৭; ৬ষ্ঠ বৈঠক ১৪ সেপ্টে-১৭সেপ্টে ১৯৯৭; ৭ম বৈঠক ২৬ নভে-৩০ নভে ১৯৯৭) সাতটি বৈঠকের সফল সমাপ্তি ঘটে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখে। উক্ত দিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের লবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চীফহুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির পক্ষে সমিতির চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা ওরফে সন্তু লার্মা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চুক্তি ঃ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক,খ,গ,ঘ)সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন:

(ক) সাধারণ

১. উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২. উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন,

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধান ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩. এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে:

ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য : আহবায়ক

খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান : সদস্য

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি : সদস্য

৪. এই চুক্তি উভয়পক্ষের তরফ হইতে সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি ববলবৎ থাকিবে।

(খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯,(রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থনীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯,বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯) এবং ইহার বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ধারাসমূহের নিম্ন বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করিবার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন:

১. পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত 'উপজাতি' শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২. "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ"-এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩. "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪. ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩(তিন)টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ(১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১,২,৩ও৪ — মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা(৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে — "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিন্তা

Dhaka University Institutional Repository

এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"

৫. ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদ নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহনের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"-এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন — অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬. ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭. ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮. ১৪ নম্বর ধারায় চেয়াম্যানের পদ কোন কারনে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯. বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে: আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয় ; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০. ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দ গুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১. ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২. যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বার্নিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"-এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ" এবং "চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা

Dhaka University Institutional Repository

হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিতি থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩. ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উ-ধারা (২)এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪. (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে: "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।"

Dhaka University Institutional Repository

(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩)-এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্তত,বরাকস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫. ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩)-এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬. ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১)-এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭. (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

(খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮. ৩৮ নম্বর ধারার উ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপধারা (৪) সংশোধান করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯. ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপধারা সংযোজন করা হইবেঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্ত

Dhaka University Institutional Repository

রিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০. ৪৫ নম্বর ধারার উপধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১. ৫০,৫১ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে: এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পরিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থে পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২. ৫৩ ধারা (৩) উপ-ধারায় "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. ৬১ নম্বরধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪. (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে; আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপ-জাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫. ৬৩ নম্বর ধারা তৃতীয় পঙক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬. ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে:

Dhaka University Institutional Repository

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন করিতে পারিবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Ftringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭. ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে: আপাততঃ বলবৎ অন্য

Dhaka University Institutional Repository

কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮. ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উথাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯. ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০. (ক) ৬৯ ধারার উপধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদানক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" — এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮. ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে: পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯. ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০. (ক) ৬৯ ধারার উপধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদানক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" — এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

(১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা;

(২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা;

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬ (খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪. পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে:

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

(খ) পুলিশ (স্থানীয়);

(গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;

(ঘ) যুব কল্যাণ;

(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

(চ) স্থানীয় পর্যটন;

(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;

(জ) স্থানীয় শিল্প-বানিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

(ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;

(ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;

(ট) মহাজনী কারবার;

(ঠ) জুম চাষ।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস-এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবেঃ

(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি;

(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

(গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

(ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;

(চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

(ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালিটির অংশ বিশেষ;

(জ) সিনেমা, যাত্রা,সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

(ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কাশনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

(ঞ) ব্যবসার উপর কর;

(ট) লটারীর উপর কর;

(ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর ।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১. পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সালের ১৯,২০ ও ২১ নং আইন)-এর বিভিন্ন ধারা

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২. পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩. চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবেঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

Dhaka University Institutional Repository

অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪. পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবেন।

৫. পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্যাদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬. পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকুলে প্রদত্ত প্রযোজ্য বিষয় পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮. (ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তবর্তীকালীণ সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন তিন পার্বত্যজেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

(খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯. (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পরিবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকিবে।

(চ) পরিষদ ভারী শিল্প লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১. ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সালের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২. পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩. সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪. নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবেঃ

(ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

(ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেনঃ

১. ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ' ৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ'৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদেরনির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২. সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি

Dhaka University Institutional Repository

জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গাজমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্তি ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩. সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪. জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিরূপত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ সেই সব জায়গাজমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরনের পূর্ণ ক্ষমতা এ কমিশনের থাকিবে। এ কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না। এ কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)-এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবেঃ

(ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

(খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

(গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

(ঘ) বিভাগীয় কমিশনার /অতিরিক্ত কমিশনার;

(ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬. (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইবে।

(খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭. যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮. রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বৎসরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়েঅজনীয় অবকাঠামো তৈরী করিবার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০. কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদানঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১. উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায় বিকশিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১২. জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রনাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩. সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমা দানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতি তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪. নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫. নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৬. জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি

Dhaka University Institutional Repository

সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

(ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

(খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতিকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

(গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবল মাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

(ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়োছেন কিন্তু বিবদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

(চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আৰকর্মসংস্থানমূলক কাজে সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহনের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(ছ) জনসংহত সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭. (ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসিবার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সময়সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পরিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যাক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮. পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী ও আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে।

১৯. উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে ঃ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।

(২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ।

(৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

(৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

(৫) চেয়ারম্যান / প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

(৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি।

(৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি।

(৮) সাংসদ, বান্দরবান।

(৯) চাকমা রাজা।

(১০) বোমাং রাজা।

(১১) মং রাজা।

(১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজতীয় সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রাহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং তারিখ সম্পাদিত ও স্বাক্ষরযুক্ত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ)

আহ্বায়ক

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি

বাংলাদেশ সরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)

সভাপতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ঃ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রামাণ্য বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ঃ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রামাণ্য বিশ্লেষণ

❑ ভূমিকা ঃ

বর্তমান বিশ্ব শান্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আমাদের সীমারেখায় অশান্তি থাকবে এটা কাম্য হতে পারে না। সে কারণেই বিভিন্ন সময় যেসব সরকার ক্ষমতায় এসেছিল তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। আমরাও চেষ্টা করেছি, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা সমঝোতায় আসতে পেরেছি। এটাই বড় কথা। আমাদের সদিচ্ছা ছিল, তাই আমরা সফল হয়েছি।[৩১] বাস্তবতাও তাই, যে কোন সমস্যা সমাধানে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে যুক্তি নির্ভর রাজনৈতিক সমাধানই শ্রেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এমন এক অশান্ত অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল যা শুধুমাত্র ইন্সার্জেন্সির মাধ্যমে শান্ত করা সম্ভব ছিল না। তবে একথাও সত্য এই অশান্ত অবস্থা অনতিক্রম্য ছিল না। ইন্সার্জেন্সির মাধ্যমে যেমন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় তেমনি জবরদস্তির মাধ্যমেও শান্তি অর্জন অসম্ভব। রাজনৈতিক অঙ্গীকার, মানবিকতা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণের প্রতি মানুষের প্রতি, দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকলে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা- 'পার্বত্য চট্টগ্রাম' বিষয়ে সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, নিকট অতীত

Dhaka University Institutional Repository

কাল থেকে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে সকল সরকারই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এরশাদ সরকার আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে চেষ্টা করেছেন, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯ সালের ১৯নং ২০নং এবং ২১নং আইন পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। পরবর্তীতে খালেদা জিয়া সরকারও জনসংহতি সমিতির সাথে পার্বত্য সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ১০ জুলাই ১৯৯২ তারিখে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তৎকালীন সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদ বীর বিক্রম। অন্যদিকে শান্তিবাহিনীও সরকারকে সহযোগিতার লক্ষ্যে একতরফাভাবে ১৯৯২ সালের ১ আগষ্ট থেকে অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করে এবং দফায় দফায় ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত অস্ত্র বিরতির সময়সীমা বৃদ্ধি করে। উল্লেখ্য যে, সংসদীয় কমিটির পাশাপাশি তৎকালীন সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননকে প্রধান করে অন্য একটি উপকমিটিও গঠন করা হয়। খালেদা জিয়া সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সংসদীয় কমিটির সাথে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের ৭টি এবং উপকমিটির সাথে ৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি বৈঠক শেষেও কার্যতঃ কোন চুক্তি না হলেও এটা অনুধাবন করা যায় যে, শান্তি স্থাপনে প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার তিন মাসের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ তারিখে মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় সংসদের চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক শেষে ১৭ সেপ্টেম্বর ৯৭ তারিখে সন্তু লারমা ঘোষণা দেন যে, জাতীয় কমিটি এবং জন সংহতি সমিতি একটি খসড়া শান্তি চুক্তিতে উপনীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৬ নভেম্বর ৯৭ তারিখে সপ্তম বৈঠক শুরু হয় এবং ২ ডিসেম্বর ৯৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তির পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন মন্তব্য এবং রাজনৈতিক দলের অবস্থানের কারণে চুক্তি নিয়ে দেশের সাধারণ জনগণ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েন। এমতাবস্থায় দলমত নির্বিশেষে একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যা শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ১৯৮৯ সালের ১৯নং ২০নং এবং ২১নং আইনের সংশোধন এবং সংযোজন মাত্র। তাই যে সকল সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই চুক্তি সম্পর্কে বিতর্কের অবসান ঘটাবে।

নিম্নে ১৯৮৯ সালের আইন ও ১৯৯৭ সালের চুক্তির সেই সকল ধারার বিশ্লেষণ করা হলো যেগুলোর সঙ্গে পার্বত্য জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সরাসরি সম্পর্কিত ঃ

১। চুক্তির (ক) সাধারণ খন্ডের ১ নম্বর ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে- যা অনেকের কাছে গ্রহণীয় নয়। তাদের মতে (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা দেয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের সম অবস্থান, স্বার্থ, অধিকার খর্ব করে তাদেরকে প্রকারান্তরে সেখানে অবাঞ্ছিত করা হয়েছে। সেই সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

(খ) সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী "সমগ্র বাংলাদেশ একটি একক" সত্তা (১ নম্বর অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে "আমরা বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

জনগণ"। সংবিধানের ৬(২) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন"। তাই বাংলাদেশের কোন স্থানকে 'বাঙালী অঞ্চল" কোনটি "উপজাতি অঞ্চল" হিসাবে আলাদা করা সংবিধানিকভাবে অসম্ভব।

অন্যদিকে চুক্তির পক্ষে যাদের অবস্থান তাদের মতে ১৯৮৯ সালের ১৯, ২০ ও ২১নং আইনেও পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাকে 'উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত অঞ্চলের অবস্থান বিচার করে ১৯০০ সালের ০১ মে বৃটিশ সরকার নোটিফিকেশন ১২৩ পি.ডি. (Chittagong Hill Tracts Regulation-1900)) বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বহির্ভূত এলাকা (Excluded Area) বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সংবিধানের ২৮(৪) এবং ২৯(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন সংবিধান সম্মত।

পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হতে এবং সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে এই অনুসিদ্ধান্তে আশা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে "উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল" হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া অবাস্তব যেমন নয় তেমনি সংবিধান সাংঘর্ষিক নয়।

২। চুক্তি 'খ' খন্ডের ৪ ধারায় 'ক' ও 'খ' উপধারা অনুযায়ী প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন প্রক্রিয়া গনতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বলে অনেকে মনে করেন। তাদের মতে গণতন্ত্রের যুগে এবং গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের যে নিয়মনীতি করা হয়েছে তা অগনতান্ত্রিকই শুধু নয় অমানবিক, স্বৈরাচারী এবং হাস্যকরও বটে। কারণ পরিষদের চেয়ারম্যান সব সময় উপজাতিয় হতে নির্বাচিত হবেন। বিধানটি অগণতান্ত্রিক। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে অ-উপজাতি এবং উপজাতি।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া পরিষদে মোট ৩৩ জন সদস্যের মধ্যে ২২ জন উপজাতি (২০ জন পুরুষ ও ২জন মহিলা) এবং ১১ জন অ-উপজাতি (১০ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) সদস্য নিয়ে পরিষদ গঠনের যে বিধান করা হয়েছে তা অ-উপজাতিদের (বাঙালী) কে নির্মমভাবে ঠকানো হয়েছে। কারণ পরিষদে যে কোন বিল পাশ হবে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে, সেক্ষেত্রে অ-উপজাতিদের উত্থাপিত কোন বিল যেমন পাশ হওয়ার সুযোগ নেই তেমনি উপজাতিদের উত্থাপিত বিলে অ-উপজাতি সদস্যদের ভোটেরও কোন মূল্য নেই। কারণ দুই তৃতীয়াংশ ভোট উপাজাতীয়দের রয়েছে। তাই পরিষদে অ-উপজাতি সদস্যদের গ্রহনীয়তা হলো নামে মাত্র পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য। সুতরাং উপরোক্ত ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পরিষদ গঠন সংক্রান্ত ধারাটি সম্পূর্ণরূপে অগণতান্ত্রিক এবং কল্পনাপ্রসূত। যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের (অ-উপজাতি) স্বার্থের পরিপন্থী।

শুধু তাই নয়, আইনানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী ১৩টি উপজাতির মধ্যে মাত্র ৭টি উপজাতি পরিষেদের সদস্য হতে পারবে। বাকি ৬টি উপজাতির অধিকার হরণ করা হয়েছে। এসব উপজাতি গুলো হচ্ছে মুরং (ম্রো), ব্যোম (বনযোগী), খুমি, চাক, রিয়াং ও উসুই। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৬, ৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকের সমতা, সম অধিকার, সম সুযোগ, সম স্বাধীনতা লংঘন করা হয়েছে।

এ যুক্তির বিপক্ষে তথা চুক্তির পক্ষের মত হচ্ছে ১৯৮৯ সালের ১৯নং, ২০নং এবং ২১নং আইনেও উক্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

পক্ষে-বিপক্ষে যে যাই বলুক, বাস্তবতা হচ্ছে উক্ত ধারায় গনতান্ত্রিকভাবে প্রত্যেক উপজাতি এবং অ-উপজাতির সম

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার নিশ্চিত করা হয়নি। আইন পাশের ক্ষেত্রে উপজাতিদের লাগামহীনতা যে কোন আইন, বিধি, অনুশাসন তৈরী করতে সহায়তা করবে। তা ছাড়া ৬টি ক্ষুদ্র উপজাতির নাগরিক অধিকার যেমন- নির্বাচনে অংশ গ্রহন করা (প্রার্থী হওয়া) কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাই বলা যায় এই ধারা মৌলিক অধিকার হরনের এবং সাম্য ও গনতন্ত্র বিনাশের এক জঘন্য দৃষ্টান্ত।

৩। চুক্তি ৪ ধারার 'ঘ' উপধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না। উক্ত ধারার বিপক্ষের মত হচ্ছে এই আইনানুযায়ী সার্কেল চীফ এবং হেডম্যান যেহেতু উপজাতি হতে মনোনীত/নির্বাচিত, সেহেতু তাদের কাছ থেকে অ-উপজাতীর সার্টিফিকেট পেতে বাঙালীরা বৈষম্যের স্বীকার হবে। এক্ষেত্রে সংবিধান, বাংলাদেশী জাতীয়তা, রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিকত্ব - কিছুই তাকে defend করবে না, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন বিধিও তাকে defend করবে না। এটি সংবিধানের ১৯(১) অনুচ্ছেদের সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা এবং ১৯(২) অনুচ্ছেদের মানুষে মানুষে অসাম্য বিলোপ, সম্পদের সুষম বন্টন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণকে অসম্ভব করে তুলবে। তদুপরি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে কারো পক্ষে দেশের যে কোন স্থানে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকলেও এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা পরিষদগুলির নির্বাচনে সেখানকার কোন বাংলাভাষী

Dhaka University Institutional Repository

তথাকার বাসিন্দা হলেও মৌজার হেডম্যানসহ সার্কেল চীফের কাছ থেকে অ-উপজাতীয় এবং স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্যন্ত নিজেদের জন্য সংরক্ষিত সামান্য সংখ্যক আসনেও দাড়াতে পারবে না। ফলে এটি সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ অনুচ্ছেদের গনতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরনকে বিনষ্ট করেছে। চুক্তির পক্ষের মতামত হচ্ছে হ্যাডম্যান, সার্কেল চীফ উপজাতি হলেও সাটিফিকেট প্রদানে বৈষম্য সৃষ্টি করবেনা।

পক্ষে বিপক্ষে যে যাই বলুক বাস্তবতা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে জববাদিহিতা রাখা প্রয়োজন ছিলো। কিংবা ১৯৮৯ সালের ১৯,২০ ও ২১ নং আইন অনুযায়ী ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা অটুট রাখা দরকার ছিল কিংবা বৈষম্যের স্বীকার হলে ডেপুটি কমিশনারের নিকট কিংবা উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করার বিধান থাকা প্রয়োজন ছিল।

৪। চুক্তির ১৪ নং ধারার 'খ' উপধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের ৩২ নম্বর ধারার ২ নং উপধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রনয়ন করা হয়েছে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত,অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।" উক্ত ধারার বিপক্ষের মত হচ্ছে ১৯৮৯ সালের আইনে বলা ছিল "তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।" কিন্তু বর্তমান আইন অনুযায়ী একদিকে বাঙালী (অ-উপজাতি) অন্যদিকে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র উপজাতি সমূহ চরম ভাবে অধিকার বঞ্চিত হলো। তাদের মৌলিক অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ বিনষ্ট করলো। এক্ষেত্রে বাঙালীরা (অ-উপজাতি) বঞ্চিত হয়েছে সরাসরি আর ক্ষুদ্র উপজাতীয়রা বঞ্চিত হয়েছে "সংখ্যানুপাত" শব্দটি বিয়োজনের মধ্য দিয়ে। যেহেতু শিক্ষার ক্ষেত্রে চাকমারাই বেশী শিক্ষিত সেহেতু ক্ষুদ্র উপজাতি গুলো চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভাবেই বঞ্চিত হবে। অথচ উক্ত এলাকায় যদি সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদের কথা বলা হয় সেক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চলে অনগ্রসর হিসাবে সুযোগ লাভ করবে এই ক্ষুদ্র উপজাতিগুলো এবং অ-উপজাতি (বাঙালী)। তাছাড়া সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে" এবং ২৯(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষবেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।" এই বিধানদ্বয় পার্বত্য চুক্তির ১৪(খ) ধারানুযায়ী সুস্পষ্ট ভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে।

অন্যদিকে চুক্তির পক্ষের কথা হচ্ছে সংবিধানের ২৮(৪) এবং ২৯(৩) এর 'খ' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উক্ত ধারা সংবিধান সাংঘর্ষিক তো নয়ই বরং সাংবিধানিক। বস্তুতঃ অনগ্রসর শ্রেনী/ গোষ্ঠীর জন্য কোন বিধানই ২৯ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হতে পারে না।

পক্ষে-বিপক্ষে যে যাই বলুক বাস্তবতা হচ্ছে উক্ত ধারা অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলে অ-উপজাতি (বাঙালী) এবং ক্ষুদ্র উপজাতীয়রা চাকুরী লাভের ক্ষেত্রে চরমভাবে বৈষম্যের স্বীকার হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। চুক্তির ২১নম্বর ধারানুযায়ী ১৯৮৯ সালের আইনের ৫০, ৫১, ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করে তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হয়েছে- "এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবেন। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।"- উক্ত ধারা বিপক্ষের মত হচ্ছে এতে করে ১৯৮৯ সালের ৫১ ধারায় '১' উপধারা অনুযায়ী পরিষদের কোন কার্যক্রম যদি জনস্বার্থে পরিপন্থী হতো তাহলে সরকার আদেশ দ্বারা পরিষদের ঐ কার্যক্রম বাতিল করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে পরিষদ যদি জনস্বার্থের বিরুদ্ধে তথা অ-উপজাতি ও ক্ষুদ্র উপজাতীয়দের স্বার্থ বিরোধী কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন তাহলে সরকার বর্তমান পরিষদকে শুধু পরামর্শ দিতে পারবেন- কার্যক্রমটি বাতিল করতে পারবেন না। আর সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করা না করা পরিষদের এখতিয়ার।

চুক্তির ২১ ধারা সম্পর্কে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরীর মতে "১৯৮৯ সালের ৫০, ৫১, ৫২ নম্বর ধারা তিনটি সম্পূর্ণ বাতিল করে পার্বত্য চুক্তির 'খ' খন্ডের ২১ নম্বর ধারায় যেটুকু অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা রীতিমত আশংকাজনক। কার্যতঃ এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের এবং এর তিন জেলার উপর বাংলাদেশ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রায় পুরোপুরি বিলুপ্ত হলো। বর্তমান চুক্তির 'গ' খন্ডের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ'- এর বিষয়াদি এবং 'খ' খন্ডের পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদি একত্রে মিলিয়ে এবং

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধান ও ১৯৮৯ সালের আইনের সঙ্গে তুলনা করলে এমনটি মনে হতে পারে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম কার্যতঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এর উপর বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাচ্ছে। আর তিনটি পার্বত্য জেলাকে প্রদেশ বা প্রায় স্বাধীন রাজ্য করে যেন একটি কনফেডারেল কাঠামো বা কমপক্ষে স্বতন্ত্র ফেডারেল কাঠামোর রাষ্ট্র অবয়ব পাচ্ছে।" [৩২]

চুক্তির পক্ষের মত হচ্ছে উক্ত বাতিলকৃত ধারাগুলো আঞ্চলিক পরিষদের কাজে সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপ রহিত করবে, জনস্বার্থে কোন ক্ষতি সাধন হবে না। তাছাড়া ইহার ফলে ফেডারেল রাষ্ট্রের জন্মের কোন সম্ভাবনা নেই এবং বাংলাদেশ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হওয়ারও কোন অবকাশ নেই।

পক্ষে বিপক্ষে যে যাই বলুক না কেন বাস্তবতা হচ্ছে 'আঞ্চলিক পরিষদ' এবং 'জেলা পরিষদ প্রায় এর কার্যক্রম লাগামহীন হয়ে পড়বে এবং জনাবদিহিতা নষ্ট হবে। অ-উপজাতি এবং ক্ষুদ্র উপজাতীয়দের স্বার্থ বিরোধী (জনস্বার্থে) কার্যক্রম গ্রহণ উগ্র আঞ্চলিকতা বাদীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে। যদি এরকম কোন কার্যক্রম কোন কালে গ্রহণ করা হয় তাহলে তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনরায় অশান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৬। চুক্তির ২৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের আইনের '৬১ নম্বর ধারায় তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত 'সরকারের' শব্দটির পরিবর্তে 'মন্ত্রণালয়ের' শব্দটির প্রতিস্থাপন করা হইবে। উক্ত ধারার বিপক্ষের মতামত হচ্ছে একটি শব্দের প্রতিস্থাপন দ্বারা একদিকে অ-উপজাতীয় এবং ক্ষুদ্র উপজাতীয়দের অধিকার বিপন্ন হবে অন্য দিকে বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতা ও অধিকার শেষ করে দিচ্ছে আপীল প্রশ্নে। কারণ এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ

Dhaka University Institutional Repository

হলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করতে পারতেন এবং আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। কিন্তু বর্তমান আইনে সরকারের পরিবর্তে মন্ত্রণালয় হওয়াতে সমস্যা এখানেই যে চুক্তির 'খ' কন্ডের ৪ ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যান উপজাতীয় এবং 'ঘ' খন্ডের ১৯ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী উপজাতীয় হতে নির্বাচিত হবেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে পরিষদ কিংবা চেয়ারম্যানের কোন আদেশ যদি অ-উপজাতীয় কিংবা ক্ষুদ্র উপজাতীয়দের স্বার্থে আঘাত আসে আর সে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/গোষ্ঠী যদি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে আপীল করেন ;তাহলে মন্ত্রণালয় সে আপীলের কী রায় দেবে? এ প্রশ্নের উত্তর অ-উপজাতীয়দের কাছে খুবই স্পষ্ট যে চেয়াম্যানের আদেশই এখানে বহাল থাকবে। কারণ মন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব লাভ ও নিয়োগ পদ্ধতি এমনই যে পরিষদ তিনটির চেয়ারম্যানকে এবং আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানকে ডিংগিয়ে তিনি কিছুই করতে চাইবে না। অন্যদিকে আপীল সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতাও রহিত হয়েছে।

চুক্তির পক্ষের মতামত হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং দ্রুত আপীল নিষ্পত্তির জন্যই মন্ত্রণালয়ের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে।

পক্ষে বিপক্ষে যে যাই মতামত দিয়ে থাকুক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে উক্ত আইনের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে অ-উপজাতীয় এবং ক্ষুদ্র উপজাতীয়রা ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হবার আশংকাই বেশি। শুধু তাই নয় জেলা পরিষদ নেতৃবৃন্দের বিরোধী গোষ্ঠী সমূহও এই ধারা বলে সংক্ষুব্ধ হতে পারে এবং ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হতে পারে। তাই আপীলের ক্ষেত্রে আরো স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৭। চুক্তির ২৪ ধারার 'ক' উপধারা অনুযায়ী ১৯৮৯ সালের আইনের ৬২নং ধারার (১) উপধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপধারাটি প্রণয়ন কয়া হইবে; আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সব-ইন্সপেকটর ও তদনিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

উক্ত ধারার বিপক্ষের মতামত হচ্ছে ১৯৮৯ সালের আইনে ছিল "তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।"- কিন্তু বর্তমান আইন অনুযায়ী অ-উপজাতীয়রা যেমন অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, ঠিক তেমনি পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র উপজাতীয়রাও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে উপজাতীয়দের নামে চাকমাদেরই চিরস্থায়ীভাবে মাত্রাধিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হবে। যা সংবিধান অনুযায়ী গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলি লংঘিত হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডঃ হাসানুজ্জামান চৌধুরী লিখেছেন, ১৯৮৯ সালের আইনের ৬২(১) ধারা অনুযায়ী পুলিশ নিয়োগ সংক্রান্ত অধিকার এযাবৎ বাস্তবায়িত হয়নি আইন, পদ্ধতি ও নিয়ন্ত্রণগত জটিলতা এবং বাস্তব সমস্যা বিবেচনায়। ..... এবার থেকে পুলিশের সহকারী নয় বরং সাবইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে সকল নিয়োগ দিবে পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদ তিনটি। তিনি আরো বলেন শান্তি বাহিনী নিয়ন্ত্রিত জেলা পরিষদের যদি খুনি, সন্ত্রাসী ক্যাডারদের পুলিশের কর্মকর্তা ও কনসটেবল করে দেওয়া হয় তাহলে আইন-শৃঙ্খলার কি অবস্থা দাঁড়াবে, আর বাঙালীদেরই বা কি হবে, তা সহজেই অনুমেয়।[৩৩]

চুক্তির পক্ষের মতামত হচ্ছে এই ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকারের অর্থ এই নয় যে, অ-উপজাতীয়রা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। আর ক্ষুদ্র উপজাতীয়রা অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না, বরং তারা শিক্ষা-দীক্ষায় অধিক মনোনিবেশ করবে।

পক্ষে বিপক্ষে মতামত যাই হোক না কেন, উক্ত আইনের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী অ-উপজাতীয় (বাঙালী) এবং ক্ষুদ্র উপজাতীয় জেলা পুলিশে নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের স্বীকার হবে। তাই নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৮৯ সালের আইনের বিকল্প (চিন্তা করা উচিত হয়নি) হয় না। শুধু তাই নয় পরিষদকে জেলা পুলিশ নিয়োগের ক্ষমতা প্রদানও পুনরায় ভেবে দেখা দরকার। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কারও মতে অর্থনৈতিক, কারও মতে রাজনৈতিক, কেউ মনে করেন দুটোই সমস্যার কারণ। প্রধান কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হলেও এই সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে বহুমাত্রিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও এই সমস্যার রয়েছে প্রশাসনিক, সামরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক, কূটনৈতিক ও মানবিক দিক এবং এর একটি অপরটির সঙ্গে এমনই নিবিড়ভাবে যুক্ত যে, কোনওটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সম্ভব নয়। এই সমস্যা সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং তাদের দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন লাভকারী বাঙালী সম্প্রদায়।[৩৪] তাই এই সমস্যার সমাধানও করতে হবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তথা সরকারকে।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তৎকালীন সরকার এবং জনসংহতি সমিতির সাথে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন আজ অবধি হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরের অষ্টম বর্ষপূর্তি (২০০৫) উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন আলোচনা সভায় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, গুণিজন ও বুদ্ধিজীবিদের বক্তব্য থেকে একথা বলা যায় যে, আজ পর্যন্ত চুক্তি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেন, '৯৭ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিষয়ে '৯৮ সালে আইন প্রণয়নের সময়ই প্রতারণা শুরু হয়। সরকারের সাথে একটি বিশেষ বৈঠক করেও

Dhaka University Institutional Repository

তা রোধ করা যায়নি। তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হয়তো ভেবেছিলেন যে, চুক্তি হয়ে গেছে। অস্ত্র জমা পড়েছে। কাজ তো শেষ। কিন্তু বঞ্চিত আর প্রতারিত মানুষের চেয়ে বড় অস্ত্র আর কী হতে পারে।[৩৫] একই আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মণি স্বপন দেওয়ান বলেন, যতদিন এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এবং মূলধারায় রাজনীতিকরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সমতলের অভিন্ন সমস্যা হিসেবে, জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করবেন ততদিন এর সমাধান হবে না।[৩৬]

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পর্কে গবেষণা কালে ফিল্ড ওয়ার্ক তথা স্বাক্ষাতকার পদ্ধতি গ্রহণ করে যে মৌলিক বিষয়টি বের হয়েছে তার সারমর্মও এরকম। অর্থাৎ চুক্তির সফল ও সুন্দর বাস্তবায়নের মধ্যেই উক্ত অঞ্চলের শান্তি নিহিত। চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মত আছে, থাকতে পারে কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে যে সব ক্ষেত্রে মত পার্থক্য বিদ্যমান তার সুন্দর সমাধানের মধ্যেই নিহিত আছে চীর হরিৎ সবুজ-শ্যামল পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি। তবে লক্ষ রাখতে হবে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতীয় জনগণ দীর্ঘ দিন যাবৎ যে সকল বস্তুগত ও মানসিক যাতনা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে তার একটি অর্থনৈকিতক ও রাজনৈতিক সমাধান তাদের সামনে পেশ করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালী জনগোষ্ঠীকেও তাদের বর্তমান দারিদ্র ও অনগ্রসরতার হাত থেকে উত্তরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। শুধু তাই নয় উপজাতীয়দের মধ্যে ক্ষুদ্র উপজাতি গুলোর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যেন সংগ্রাম করতে না হয় সেদিকটিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আলোচনায় দেখা যায় উপজাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের নিকট সাধারণভাবে বাংলাদেশ সরকার এর প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঐহিত্যগতভাবে বিদ্যমান। সরকারের ওপর তাদের বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ দিয়ে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তার জন্য প্রয়োজন সরকার সমূহের কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। তাই ১৯৮৯ সালের আইনের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তির ধারা-উপধারা গুলোর সুন্দর বাস্তবায়নের মধ্যেই শান্তি নিহিত। যে সব ধারা উপধারা নিয়ে মত পার্থক্য আছে তার জন্য প্রয়োজন সরকার এবং জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের এক টেবিলে বসা তথা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসা। উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দূরদর্শিতাই পারে একটি শান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম উপহার দিতে যা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সূত্র

পরিশিষ্ট- ক

১. নূহ-উল-আলম লেনিন, জুম পাহাড়ে শান্তির ঝরনাধারা, ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, গণপ্রকাশ, মে ১৯৯৮, পৃঃ ৬৬।

২. R. H. Sneyd Hutchinson, Chittagong Hill Tracts (in east Bangal and assam district gazetter's, Allahabad, 1909.

৩. Hunter, Statistical Account of the chittagong Hill tracts vol. vi, LONDON, 1876, P :17.

৪. মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক : পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতি মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ :১৮।

৫. প্রফেসর পিয়ের বেসেইন : পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি (অনুবাদ অধ্যাপিকা সুফিয়া খান), বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ : ১০।

৬. সুপ্রিয় তালুকদার, চাকমা সংস্কৃতির আদিরূপঃ রাঙামাটি, ১৯৮৭ ঢাকা, পৃ : ১৬-১৭।

৭. Captain T.H. Lewis, The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers there in 1869. P-28.

৮. মে.জে. (অবঃ) সৈয়দ মু ইবরাহিম বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃঃ২২।

৯. মে.জে. (অবঃ) সৈয়দ মু ইবরাহিম বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃঃ২৫।

১০. মে.জে. (অবঃ) সৈয়দ মু ইবরাহিম বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত পৃঃ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

১১. কামিনী মোহন দেওয়ান, পার্বত্য চট্টলের একদীন সেবকের জীবন কাহিনী, রাঙামাটি, দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৭০, পৃ:১৮।

১২. সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রসঙ্গ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৩৯২ বাংলা, পৃ:১১-১২।

১৩. সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত পৃ:১৩।

১৪. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। আগামী প্রকাশন, ঢাকা, পৃ:৭।

১৫. সিদ্ধার্থ চাকমা প্রাগুক্ত পৃ:৩৬।

১৬. সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত পৃ:৩৯।

১৭. সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত পৃ:৪৬।

১৮. সিদ্ধার্থ চাকমা, প্রাগুক্ত পৃ:৪৮।

১৯. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, প্রাগুক্ত পৃ:৪।

২০. মে. জে. (অবঃ) সৈ. মু. ইবরাহিম, বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃ:৮০।

২১. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, প্রাগুক্ত, পৃ:২২।

২২. মে. জে. (অবঃ) সৈ. মু. ইবরাহিম, বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃ:৮৮।

২৩. দৈনিক ভোরের কাগজ, ০১/১১/১৯৯৯ ইং।

২৪. মে. জে. (অবঃ) সৈ. মু. ইবরাহিম, বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃ:৯৪।

২৫. মে. জে. (অবঃ) সৈ. মু. ইবরাহিম, বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃ:৯৪।

২৬. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, প্রাগুক্ত, পৃ:২৪।

২৭. মে. জে. (অবঃ) সৈ. মু. ইবরাহিম, বীর প্রতীক, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ এখনো ষড়যন্ত্র, পৃ:১৫২-৫৩।

২৯. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, প্রাগুক্ত, পৃ:৩৪।

৩০. পাক্ষিক মানবাধিকার, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

৩১. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, দৈনিক সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।

৩২. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, পাবর্ত্য শান্তিচুক্তি একটি আগাগোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোশিও পলিটিক্যাল রিসার্চ, ঢাকা- ০১, জানুয়ারী, ১৯৯৮, পৃ:২২।

৩৩. ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ:২৮।

৩৪. শাহরিয়ার কবির, শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ:১১।

৩৫. দৈনিক প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৫।

৩৬. দৈনিক প্রথম আলো, ৩ ডিসেম্বর, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী ও সংবাদপত্র

পরিশিষ্ট-খ

১। বদরুদ্দিন ওমর ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম নিপীড়ন ও সংগ্রাম, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৭

২। আতিকুর রহমান ঃ প্রেক্ষিত, পার্বত্য সংকট, ১৯৯৭

৩। হুমায়ুন আজাদ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সবুজ পাহাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনা ধারা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭

৪। প্রদীপ্ত খীসা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬

৫। হাজার বছরের চট্টগ্রাম ঃ সংক্ষিপ্ত ইতহাস দৈনিক আজাদীর ৩৫ বৎসর পূর্তি, বিশেষ সংকলন, নভেম্বর ১৯৯৫]

৬। সুগত চাকমা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস

৭। নূহ-উল-আলম লেনিন ঃ জুম পাহাড়ের শান্তির ঝরনাধারা, ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, গনপ্রকাশ, ১৯৯৮

৮। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতি মূল্যায়ন, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

৯। সুগত চাকমা ঃ বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার, নওরোজ কিতাবিস্তান, বই মেলা ২০০০

১০। শাহরিয়ার কবির ঃ শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম, অনুপম প্রকাশনী, বইমেলা ১৯৯৮।

১১। প্রফেসর পিয়ের বেসেইন ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি (অনুবাদ অধ্যাপিকা সুফিয়া খান), বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭

১২। আতিকুর রহমান ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি, রাঙামাটি প্রকাশনী, ১৯৯৩।

১৩। ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী ঃ পার্বত্য শান্তি চুক্তি-একটি আগা-গোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর সোশিও পলিটিক্যাল রিসার্চ, ঢাকা, ১৯৯৮।

১৪। Mohammad Rafi & A. Mushtaque R. Chowdhury : Counting the hills: Assessing development in Chittagong hill tracts, University Press Ltd. 2001.

১৫। Hunter : Statistical Account of the Chittagong Hill tracts vol. vi, LONDON, 1876.

১৬। R. H. Sneyd Hutchinson : Chittagong Hill Tracts (in east Bengal and Assam district gazette's, Allahabad, 1909.

Dhaka University Institutional Repository

১৭। Captain T.H. Lewis : The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers there in 1868.

১৮। কামিনী মোহন দেওয়ান ঃ পার্বত্য চট্টলের একদীন সেবকের জীবন কাহিনী, রাঙামাটি, দেওয়ান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯৭০।

১৯। সিদ্ধার্থ চাকমা ঃ প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা, ১৩৯২বাং।

২০। Mijanur Rahman Selley : The Chittagong Hil Tracts of Bangladesh. The Untold Story [Center for Development Research, Bangladesh].

২১। চিন্ময় মুৎসুদ্দী ঃ অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, আগামী প্রকাশন, ঢাকা।

১. দৈনিক ইত্তেফাক
২. দৈনিক প্রথম আলো
৩. দৈনিক সংবাদ
৪. দৈনিক ইনকিলাব
৫. দৈনিক ভোরের কাগজ
৬. দৈনিক দিনকাল
৭. দৈনিক জনকণ্ঠ
8. The Daily Star
9. The Daily Independent.
১০. পাক্ষিক মানবাধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-গ

শিরোনাম ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।

নাম ঃ ..... পেশা ঃ ..... তাং- .....

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। কথাটি কি সঠিক? এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এতদঞ্চলে যুগ যুগ ধরে চলে আসা অশান্ত পরিস্থিতিকে শান্ত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে অনেকে মনে করেন। আপনি কি এই ধারণার সাথে একমত?

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ফলে দেশের পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশ সাধন সম্ভব বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। আপনি কি এই মতের সাথে একমত?

৪। পার্বত্য বাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবীকে চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে বলে অনেকেই অভিমত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আপনি কি একমত?

Dhaka University Institutional Repository

৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিকে বাঙ্গালী ও উপজাতীয়দের একটি অংশ মেনে না নেয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে চুক্তির পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলকে আরো অশান্ত করে তুলবে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির ফলে একদিকে বাঙ্গালী অন্যদিকে ক্ষুদ্র উপজাতিদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে বলে অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন। কথাটি কি এক্ষেত্রে সঠিক?

৭। চুক্তিটি এক দিকে যেমন সংবিধান বিরোধী অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গালী জাতি সত্ত্বাকে সে স্থানে (পার্বত্য অঞ্চলে) দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে বলে কেউ কেউ দাবী করেন। বক্তব্যটি কি যথার্থ?

৮। যেহেতু হেডম্যান, চেয়ারম্যান, সার্কেল চীপ উপজাতি থেকে নির্বাচিত/ মনোনীত, সেহেতু উপজাতি ও অ-উপজাতীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের বাঙ্গালীরা বৈষম্যের শিকার হবে বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন (কিংবা এটা কি সত্যি?)।

৯। অ-উপজাতি ও স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট না পেলে সংরক্ষিত আসনে বাঙ্গালীরা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না এবং ভোটও দিতে পারবে না। যাকে অনেকেই মৌলিক অধিকার লংঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে থাকেন। কথাটা কি বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? কিংবা এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

১০। চুক্তি অনুযায়ী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সব সময় উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচিত/ মনোনীত হবে। এটা গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামোর বাহিরে এবং কাল্পনিক ধ্যান ধারণা প্রসূত বলে অনেকে মতামত প্রকাশ করে থাকেন। কথাটি কি সঠিক?

১১। চুক্তির ফলে তিন জেলা পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা কর্মচারীর পদ সৃষ্টি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে যে ক্ষমতার অধিকারী হলো তাতে করে অ-উপজাতীয় এবং ক্ষুদ্র উপজাতীয়দের সংখ্যানুপাত বাতিল করা হয়েছে (সকল উপজাতীয়দের সমান সুযোগ দেয়া হয়নি)। যা সংবিধান ও গণতন্ত্র বিরোধী বলে অনেকে মনে করেন। বক্তব্যটির সাথে আপনি কি একমত?

১২। চুক্তির মাধ্যমে অ-উপজাতীয় (বাঙ্গালী) ও অন্যান্য ক্ষুদ্র উপজাতির জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত না করে উপজাতীয়দের নামে চাকমাদেরকে চিরস্থায়ীভাবে মাত্রাধিক প্রতিনিধিত্ব করার যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তাকে সংবিধান অনুযায়ী গণতন্ত্র, মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা, মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলি লংঘন ও অবমাননা করা হয়েছে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কথাটি কি যথার্থ? কিংবা এক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন?

১৩। চুক্তিতে অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়টি থাকলেও বাস্তবে উন্নয়ন ঘটেছে চাকমাদের। অন্য ক্ষুদ্র উপজাতি যেমনিভাবে উপেক্ষিত হয়েছে ঠিক তেমনি অনগ্রসর বাঙ্গালীরাও উপেক্ষিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। কথাটি কি সঠিক?

Dhaka University Institutional Repository

১৪। চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য মন্ত্রণালয়, পার্বত্য তিন পরিষদের চেয়ারম্যান, আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পরিষদগুলোর সচিব পদে কখনো বাঙ্গালী নিয়োগ পাবে না। ফলে উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ৫০ ভাগ বাঙ্গালীদের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার হরণ করা হয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। আপনার মতামত কি?

১৫। চুক্তি বাস্তবায়নে যে ধীর গতি কিংবা অনিহা (অনেকের মতে) তা কি চুক্তিটিকে অকার্যকর করে তুলবে? এক্ষেত্রে আপনার মতামত কি?

১৬। পত্র পত্রিকায় প্রাপ্ত অভিমত ও তথ্যে দেখা যায় চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপর উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর যেমন দিন দিন চাপ বাড়ছে, তেমনি অ-উপজাতীয় (বাঙ্গালী) জনগোষ্ঠী চুক্তি বাস্তবায়নে বিরোধীতা করছে এবং হুমকী দিচ্ছে। এতে করে চুক্তি বাস্তবায়ন বিলম্ব হচ্ছে- যা অনেকেরই বিশ্বাস তথা চুক্তিতে অ-উপজাতীয় (বাঙ্গালীদের) স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য ছিল তারই সত্যতা নিরূপণ। এ কথা কি সঠিক? অন্যথা আপনার মন্তব্য কি?

১৭। পার্বত্য অঞ্চলে যে সকল অ-উপজাতীয় (বাঙ্গালী) জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে তাদেরকে পার্বত্য অঞ্চল থেকে সরিয়ে আনার জন্য উপজাতীয় নেতারা দীর্ঘ দিন থেকে দাবী জানিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে উপজাতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি (দাবী) যদি স্বীকৃতি লাভ করে তাহলে এই প্রক্রিয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের অবস্থা কি হবে? এই ক্ষেত্রে চুক্তির পরিপূর্ণ/ সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব কি?

১৮। ভূমিহীনদের সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে অ-উপজাতীয়দের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটাও অনুরূপ একটি কর্মসূচী বলে অনেকে মনে করে থাকেন। কথাটা কি যথার্থ? কিংবা আপনার মতামত কি?

১৯। উপজাতীয়দের শিক্ষার হার যেহেতু কম সেহেতু দেশের সকলের শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে উপজাতীয়দের শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য চুক্তির অনুকুলে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন কি?

২০। পার্বত্য উপজাতীয়দের মধ্যে এমন কতগুলো উপজাতি আছে যারা সংখ্যার দিক থেকে খুবই ক্ষুদ্র এবং বসবাস করে গহিন অরণ্যে। এদের কাছে শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ খুবই কষ্টসাধ্য এবং ব্যয় সাপেক্ষ। যার ফলে এই সকল ক্ষুদ্র উপজাতি শিক্ষার ক্ষেত্রে আপত দৃষ্টিতে শূন্যের কোঠায়। চুক্তিতে এই সকল ক্ষুদ্র উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিল বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। আপনার মন্তব্য কি?

২১। সমতলের সাথে পার্বত্য জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত দ্রুত করা যাবে ততই উপজাতীয়রা উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে। এক্ষেত্রে চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি সরকারকে বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেয়া দরকার বলে অনেকে অভিমত দিয়েছেন। আপনি কি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

২২। শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ক্ষুদ্র উপজাতীয় গোষ্ঠী অন্য উপজাতির তুলনায় পশ্চাৎপদ এবং অনগ্রসর। চুক্তিতে এমন শর্ত রাখা প্রয়োজন ছিল যাতে করে এই সকল ক্ষুদ্র উপজাতিগুলো অন্য উপজাতিদের সাথে সমান্তরালভাবে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়। আর তাই এই সকল ক্ষুদ্র উপজাতীয়দের জন্য কর্মস্থল সনাক্ত করে সনাক্তকৃত পদ সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার বলে অনেকে মনে করেন। বক্তব্যটির সাথে আপনি কি একমত?

২৩। উপজাতীয়দের যোগ্যতা ও অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান খুব বেশী প্রচারের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব। যা উপজাতীয়দের সার্বিক উন্নয়ন এবং এদের সম্পর্কে সমতলের মানুষের ভুল ধারণা পাল্টনো সম্ভব। অথচ শান্তি চুক্তিতে এই সম্পর্কে কোন ধারা, উপধারা সংযোজন করা হয়নি বলে অনেকে অভিযোগ তুলেছেন। এ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

২৫। উপজাতীয়রা স্বাভাবিকভাবে পশ্চাৎপদ। তাই এদেরকে কর্মে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলা এবং মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থাবলী খুবই অপর্যাপ্ত। তাই এই বিষয়টি চুক্তির পাশাপাশি সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া দরকার বলে অনেকে মনে করেন। এ সম্পর্কে আপনি কি একমত?

"আন্তরিকভাবে সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ

১। খাগড়াছড়ি জেলা

২। রাঙ্গামাটি জেলা

৩। বান্দরবান জেলা

৪। প্রফেসর পিয়ের বেসেইন-এর "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি" বই থেকে সংগৃহিত।

৫। ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী-এর "পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি আগাগোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ" বই থেকে সংগৃহিত।

৬। ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী-এর "পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি আগাগোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ" বই থেকে সংগৃহিত।

৭। ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী-এর "পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি আগাগোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ" বই থেকে সংগৃহিত।

৮। ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী-এর "পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি আগাগোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ" বই থেকে সংগৃহিত।

৯। ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী-এর "পার্বত্য শান্তিচুক্তি একটি আগাগোড়া প্রামাণ্য বিশ্লেষণ" বই থেকে সংগৃহিত।

Dhaka University Institutional Repository

Khagrachari District

Dhaka University Institutional Repository

Rangamati District

Dhaka University Institutional Repository

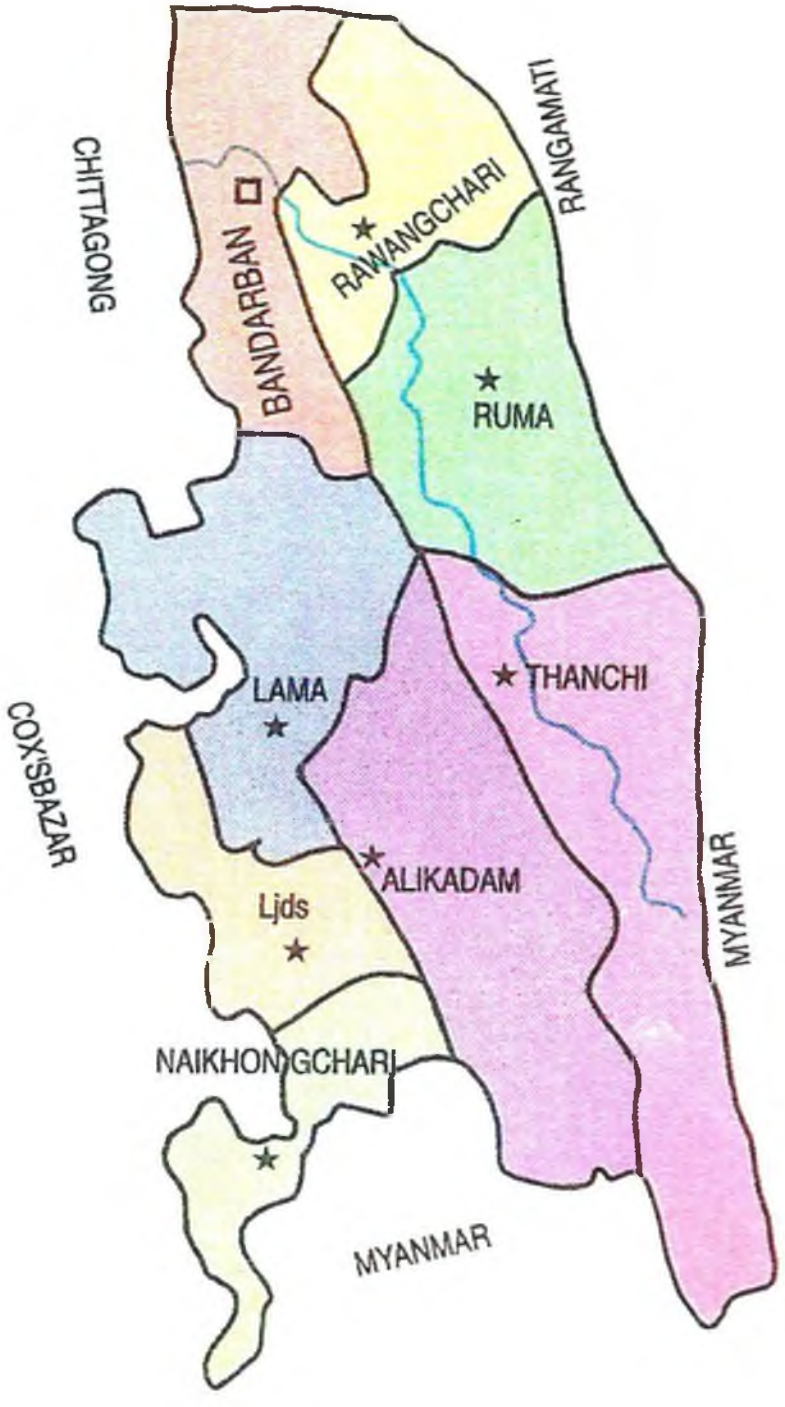

Bandarban District

Dhaka University Institutional Repository

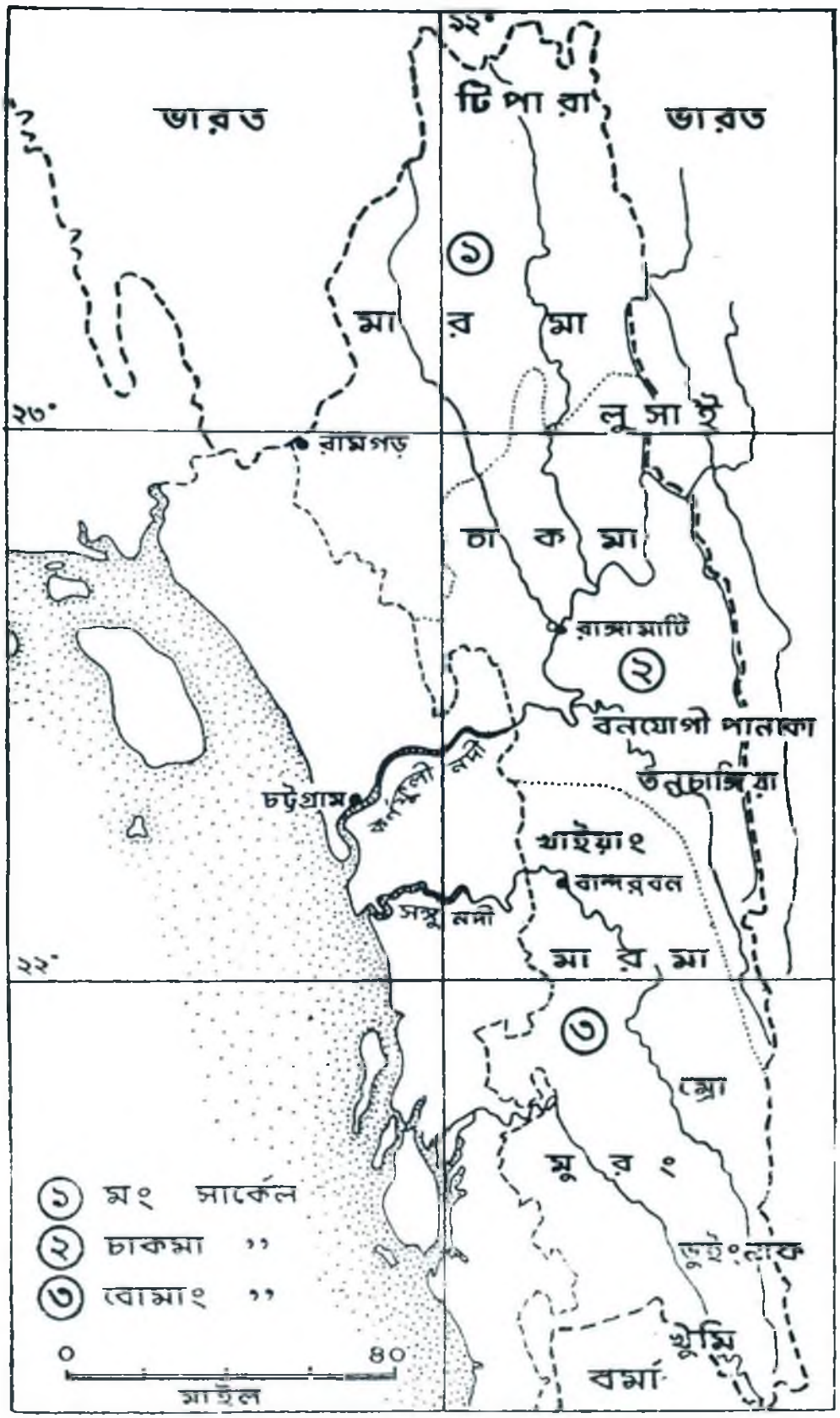

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম

(জোন সংকেত অবস্থান)

১. রাঙ্গামাটি	—RM
২. বাঘাইছড়ি	—BGH
৩. লংগদু	—LD
৪. বরকল	—BK
৫. নানিয়ারচর	—NC
৬. কাউখালি	—KK
৭. জুরাছড়ি	—JC
৮. কাপ্তাই	—KP
৯. রাজস্থলী	—RJ
১০. বিলাইছড়ি	—BC
১১. খাগড়াছড়ি	—KC
১২. পানছড়ি	—PC
১৩. দীঘিনালা	—DN
১৪. মাটিরাঙ্গা	—MR
১৫. রামগড়	—RG
১৬. মানিকছড়ি	—MC
১৭. মহালছড়ি	—MH
১৮. লক্ষ্মীছড়ি	—LC
১৯. বান্দরবান	—BB
২০. রোয়াংছড়ি	—RC
২১. রুমা	—RU
২২. লামা	—L
২৩. থানচি	—TH
২৪. আলিকদম	—AK
২৫. নাইক্ষ্যংছড়ি	—NKC

পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি সার্কেলে বিভক্ত

মং সার্কেল (প্রধান কার্যালয় মানিকছড়িতে)

চাকমা সার্কেল (প্রধান কার্যালয় রাঙ্গামাটিতে)

বোমাং সার্কেল (প্রধান কার্যালয় বান্দরবানে)

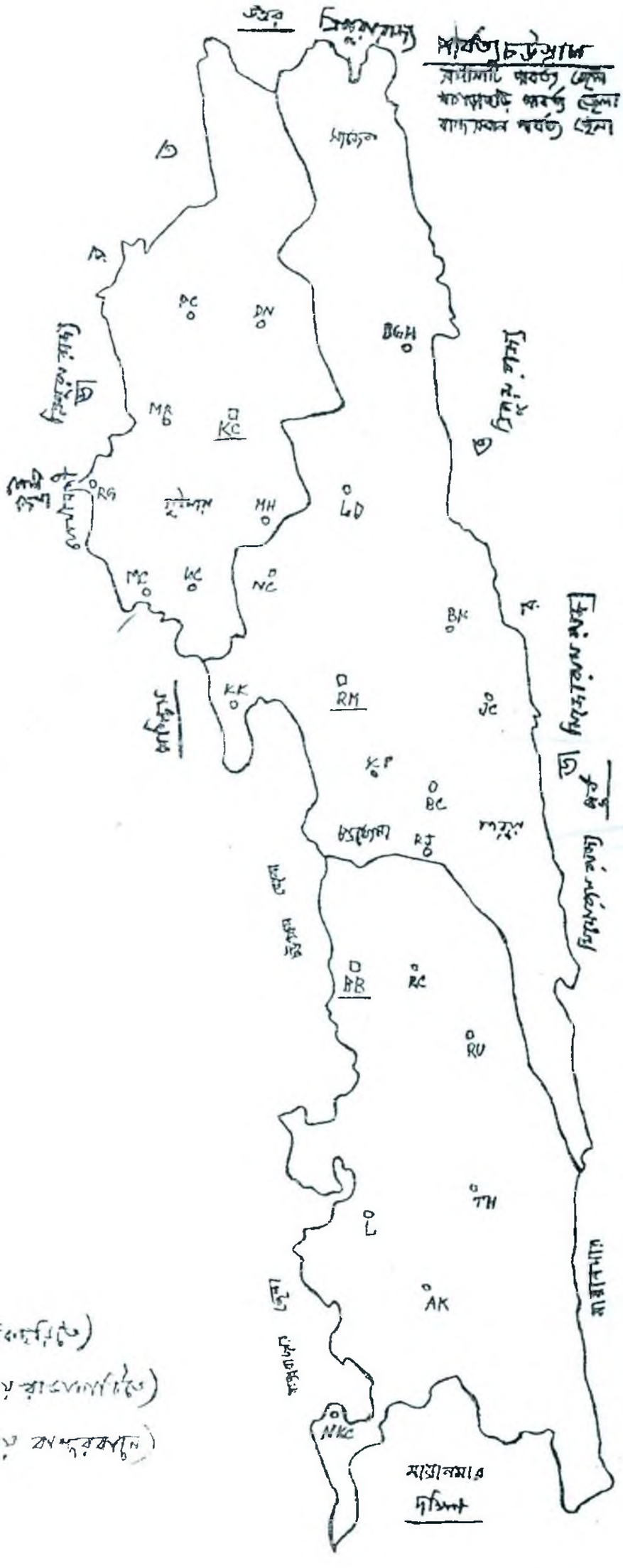

Dhaka University Institutional Repository

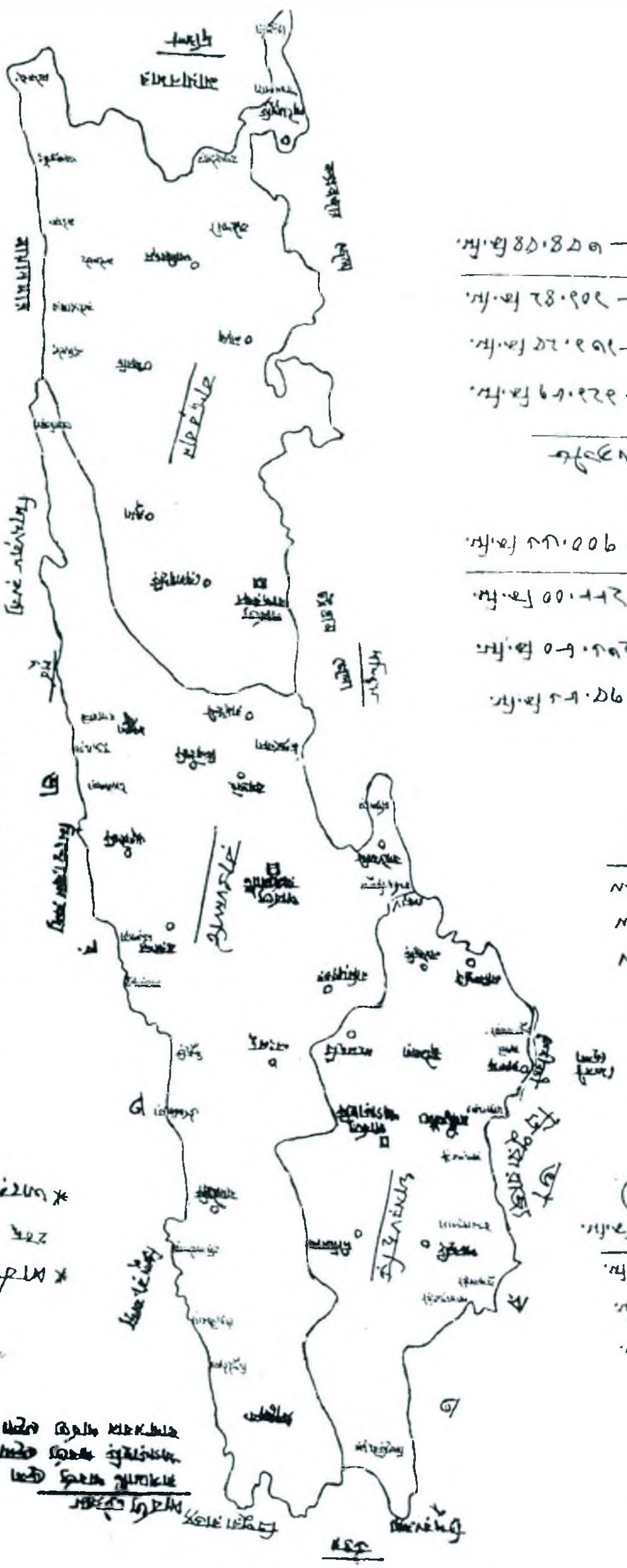

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম:
সংক্ষিপ্ত সার্বিক চিত্র

১. মোট আয়তন

ক. খাগড়াছড়ি জেলা—২৬৯৯.৫৫ বর্গ কি.মি.
খ. রাঙ্গামাটি জেলা—৬১১৬.১৩ বর্গ কি.মি.
গ. বান্দরবান জেলা—৪৪৭৯.০৩ বর্গ কি.মি.

মোট আয়তন —১৩২৯৪.৭১ বর্গ কি.মি.
(৫০৯৬ বর্গ মাইল)

২. মোট থানা

ক. খাগড়াছড়ি জেলা — ৮টি থানা
খ. রাঙ্গামাটি জেলা —১০টি থানা
গ. বান্দরবান জেলা — ৭টি থানা

মোট থানা — ২৫টি

৩. অন্য দেশের সাথে সীমান্ত

ক. মিজোরামের সাথে (ভারত) — ১৭৫.৮৬ কি.মি.
খ. ত্রিপুরার সাথে (ভারত) — ২৩৬.৮০ কি.মি.
গ. মায়ানমারের (বার্মার) সাথে — ২৮৮.০০ কি.মি.

মোট — ৭০০.৬৬ কি.মি.

৪. বি.ডি.আর. এর সীমান্ত [illegible]

ক. খাগড়াছড়ি থেকে [illegible] — ১২১.৮৭ কি.মি.
খ. [illegible] থেকে [illegible] — ১৩১.২৫ কি.মি.
গ. [illegible] থেকে [illegible] — ১০১.৪২ কি.মি.

মোট — ৩৫৪.৫৪ কি.মি.

পার্বত্য চট্টগ্রাম: জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

* পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল সম্প্রদায়ের [illegible] বাঙালী মুসলমান
* এছাড়া ১৩টি উপজাতি রয়েছে:

১। চাকমা
২। মারমা (মগ)
৩। ত্রিপুরা
৪। মুরং
৫। তঞ্চঙ্গ্যা
৬। বোম
৭। পাংখো
৮। খুমি
৯। লুসাই
১০। খিয়াং
১১। চাক
১২। উসুই
১৩। রিয়াং

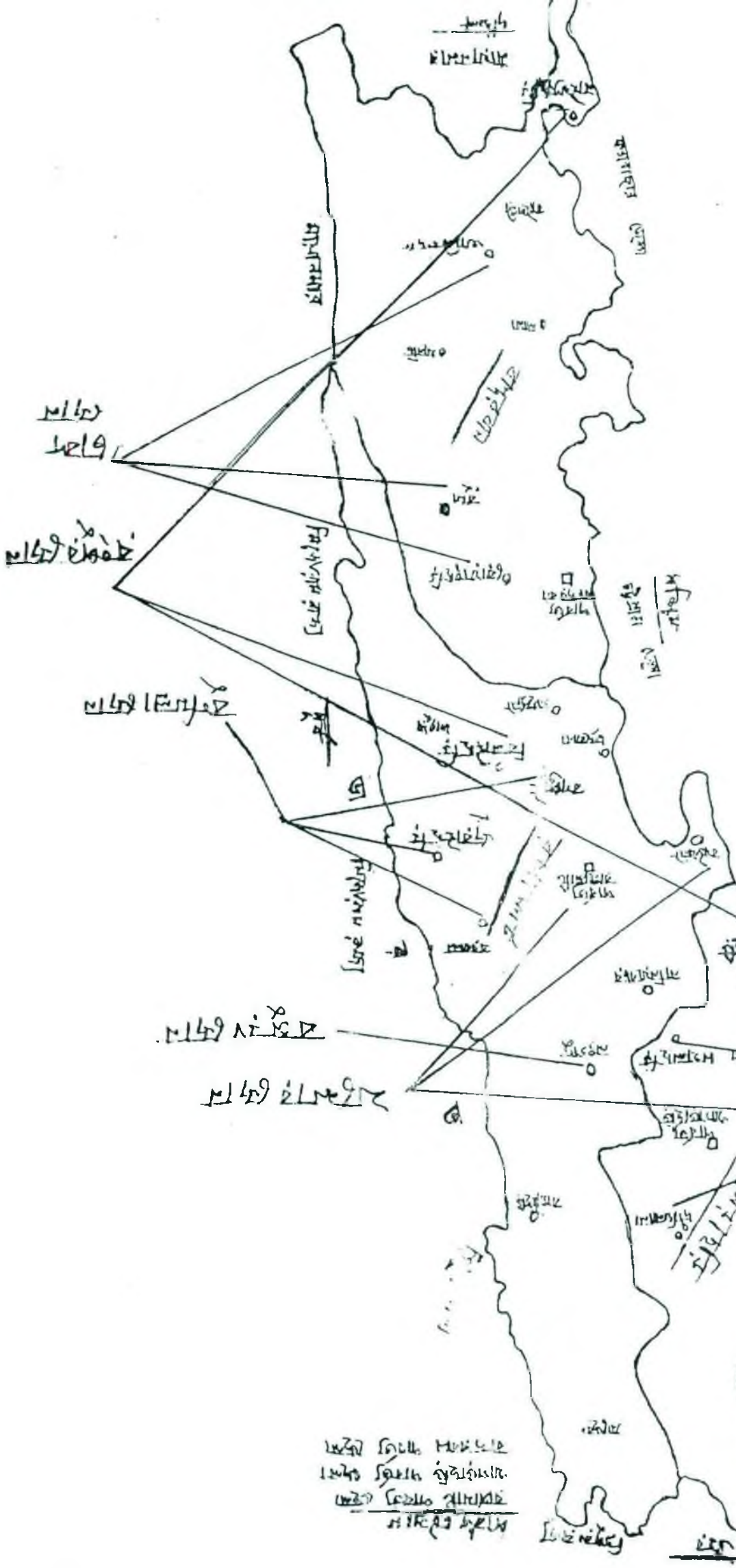

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository